তৃতীয় অধ্যায়

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস : সমাজ ও সময়ের স্বর

বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির কালে কোনও কিছুই এখন আর বিশেষ দেশকালের সময়ে সীমাবদ্ধ নয়। ফলে আমাদের চিন্তাচেতনায় অনেক বদল ঘটেছে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনে আরও সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন ঘটছে। সময় ও সমাজের এই চাঞ্চল্য, গতি লক্ষ করা যায় রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে। তাঁর লেখনী জগতের বৃত্ত জুড়ে রয়েছে গতিশীল সময় ও সমাজ। কাজেই কোনো নির্দিষ্ট কালের ব্যাপ্তির কথা তিনি বলেন না। তবে জীবন যাপনের যতটা সময় একজন মানুষ পান ততটা সময়ই তিনি বেছে নিয়েছেন। সময়ের হিসেবটা খুব অল্পকথায় তুলে ধরেন আখ্যান বয়ানের মধ্যেই। এক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাস লেখার শুরু হয়েছে নিজেরই জীবনের প্রথম আলোর চোখ জুড়ানো শৈশব-কালের স্মৃতিকথা নিয়ে। নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব আর বদলে যাওয়া সময় ও সমাজের জীবন ভাবনায় লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর'। আপন শৈশবের চেনা মানুষ, চেনা জগৎ এবং প্রত্যক্ষ অতীতের পাতা থেকে উপন্যাস লেখার খাতা খুললেন।

।। এক ।।

" 'প্রথম প্রহর' আমার প্রথম উপন্যাস। বলা যেতে পারে উপন্যাস লেখার হাতেখড়ি।"[১] 'দরবারী' গল্পগ্রন্থের আশাতীত জনপ্রিয়তা এবং বুদ্ধিজীবীমহলের সুখ্যাতি লেখকের প্রথম উপন্যাস প্রকাশের পথকে সহজ করে দিয়েছিল। ডি.এম.লাইব্রেরির গোপাল দাস মজুমদার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রমাপদ চৌধুরীকে বলেছিলেন "উপন্যাস লিখুন। যখন খুশি দেবেন, কিন্তু প্রথম উপন্যাস যেন আমি পাই। আর রয়ালটির টাকা হিসেব করে পুরোপুরি দিয়ে দেব যেদিন বই বেরোবে সেদিনই।"[২] প্রকাশকের দাবিকে মেনে নিয়েও কিন্তু তখনই প্রথম উপন্যাসের রহস্য উন্মোচন করেননি রমাপদ চৌধুরী। চেপে গিয়েছিলেন সেদিনের না বলা কথা—"শুধু ভাঙলাম না। উপন্যাস লেখাই আছে, শুধু পুনর্লিখন বাকি।"[৩] ফলে পুনর্লিখনও হয়তো কিছুটা পরিবর্তনের পর সরাসরি

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল 'প্রথম প্রহর' ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে (পৌষ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। রমাপদ চৌধুরীর বয়স তখন বত্রিশ বছর। অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিকের মতো তিনিও প্রথম উপন্যাস শুরু করলেন নিজেকে নিয়ে। নিজের শৈশব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থান নিয়ে লেখার কাজে হাত দিলেও তা যেন একান্তই আত্মজীবনী হয়ে ওঠেনি। শৈশবের ফেলে আসা সময়ের সঙ্গে জুড়ে গেছে সমাজ পরিবর্তনের তৎকালীন ধারা। স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে উঠে এসেছে অতীতের নানা ঘটনা, জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী। তুলসীদাসের একটি চৌপাই দিয়ে উপন্যাসের সূচনা—

''পহেলা প্রহরমে সবকোই জাগে
দোসরা প্রহরমে ভোগী।
তিসরা প্রহরমে তস্কর জাগে
চৌঠা প্রহরমে যোগী।''[৪]

উপন্যাসে শেষের দিকে এই চৌপাইয়ের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকম ব্যাখ্যাও দিয়েছেন লেখক। ক্রমশ তার মনে হয়েছে ''মানুষের জীবনেও চারটি প্রহর। প্রথম প্রহর নিশ্চয় শৈশব, যখন মানুষ জাগতে শুরু করে, বিস্ফারিত চোখ মেলে সবকিছু দেখতে চায়, জানতে চায়।''[৫] চলন্ত ট্রেনের কামরায় হঠাৎ দেখা হওয়া অনন্তরঙ্গিনী যার পরিচয় আখ্যানের শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাননি ঔপন্যাসিক। তিনি লেখকের জীবনের প্রথম প্রহরের কথা মনে পরিয়ে দিলেন। জীবনজিজ্ঞসার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিলেন। শুরু হল বিস্ফারিত নয়ন মেলে সবকিছু দেখার ও জানার প্রথম প্রহর।

কনকনে শীতের রাতে চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে হঠাৎ দেখা অনন্তরঙ্গিনীর মুখে শুনলেন অনেক চেনা নাম। ''জানলায় মুখ বাড়িয়ে যেন শৈশবের, প্রথম যৌবনের স্পর্শ দিতে চাইল মন। তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজলাম। না, সব বদলে গেছে। পুরানো দিনের স্মৃতিকে বিদায় দিয়ে যেন নতুন ফুল ফোঁটাতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে সেই ছোট্ট শহর।''[৬] বদলে গেছে। অনেক বদলে গেছে পুরানো সেই 'না-শহর'। অনেক বেড়ে গেছে শহরটা। চিন্তার জালে অতীতের বিক্ষিপ্ত ঘটনায় শৈশবে ফিরে গেলেন রমাপদ চৌধুরী। ঘুড়ি, লাটাই, মার্বেল, লাট্টু আর লেত্তি খেলার মাঠে। বিস্তৃত খোলা প্রান্তর চাঁদমারির ময়দান, হিজলীর বন, কংসাবতীর তীর আর বীরবাবটি ধরার আনন্দঘন

মুহূর্তে— ''চাঁদমারির ময়দানে চলে যেতাম আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে, বর্ষাকালে নতুন গজানো ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে বেড়াতাম বীরবাবটি। সিঁদুরের মত লালটুকটুকে আর ভেলভেটের মতো নরম ছোট ছোট পোকাগুলো ঘাসের আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াত। হালকা হাতে তুলে নিয়ে পুরে রাখতাম শিশির ভেতর। ... কতদিন যে বীরবাবটির খুঁজে চাঁদমারির ময়দানে চলে গিয়েছি, ফিরে এসে বকুনিও খেয়েছি বাবার কাছে।''[৭] পুঁজিবাদ, বাজার সর্বস্ব দুনিয়ায় ক্রমশ গ্রাম জীবনের ভাঙন ও ক্রমাগত নগর মহানগর গড়ে ওঠার চূড়ান্ত পর্বে বিস্তৃত খোলা মাঠ, বীরবাবটি ধরার গল্প আন্তর্জালের নিশানায় ধ্বস্ত। ছোটো বয়সের সবার খেলার জগত এখন মোবাইল, ট্যাব কিংবা ল্যাপটপ বা ডেক্সটপে বদ্ধ। এদের খেলার জন্য খোলা মাঠ গড়ে ওঠাও যেমন দুস্তর বলা যায় তেমনি মুক্তপ্রান্তরও বুঝি চায় না এদের মন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের দীর্ঘ শৈশব হিজলীর বনের মতো গা ছমছমে প্রকৃতির অরণ্যে—যে দিকগুলোতে ছোটোদের যেতে সাহস হয় না, গল্প করতে করতে অন্যমনস্কভাবে সেদিকে একদিন চলে গেল তিমু। হঠাৎ খেয়াল হল অনেক দূর চলে এসেছে সে। ভেতরে ভেতরে একটা ভয় কাজ করলেও রেল পত্তনের নিশানা দেখে বড়ো অভিভূত হয়েছিল সেদিন। রেল বসাতে এসে সাহেবের দল নাকি এখানেই প্রথম তাঁবু ফেলেছিল। যার গল্প অনেকবার শুনেছে দাদুর কাছ থেকে। তিনি নিরুর দাদু। পাড়ার ছোটোদের সকলেরই দাদু। রেলের হাইস্কুলের হেডমাস্টার সেইসঙ্গে অন্যান্য ছোটো ছোটো স্কুলগুলো তদারকির দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। বড়োরা প্রত্যেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কারণ এমন বিদ্বান লোক সমগ্র রেল কলোনি জুড়ে আর একজনও ছিলেন না। নতুন গজিয়ে ওঠা রেল কলোনির প্রথম ইট গাথার দিন থেকে দেখে আসছেন সব। খাস বিলেতি সাহেবরাও বিপদে পড়লে বুদ্ধি নিতে ছুটে আসতেন তাঁর কাছে। ছোটোদের পেলেই গল্প করতে ভালবাসতেন নিরুর দাদু। যেন মনে হত ঠাকুরদা ঝুলি নিয়ে বসে গেছেন গল্প শোনাতে—

> ''হ্যাঁ রে দাদু হ্যাঁ। ও-কারখানা আমার চোখের সামনে গড়ে তুলতে দেখেছি। এই শহর, রেললাইন, ট্রেন, সব আমার সামনে হয়েছে। ... তখন এ জায়গাটা ছিল একেবারে জঙ্গল। আর বনের মাঝখানে, ওই যেখানটার নাম ইঁদা, ওইখানে ছিল একটা মন্দির।

খড়্গেশ্বরের মন্দির ছিল ওখানে, ... সাত সমুদ্রের ওপারে যে পরীর দেশ সেখান থেকে খাস ইংরেজরা নাকি প্রথম এদেশে এসে রেলের লাইন পাতল। রেলের লাইন দিয়ে দেশটাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে মানুষগুলোকে পোষ মানাল। ... সেসব কি আজকের দিনের কথা রে, তখন সবে সালগনী পর্যন্ত রেলের লাইন এসেছে। ... দুপাশে জঙ্গল আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে তখন। সি.এম.ই-র বাংলোর পিছন দিয়ে যেখানে লাইন গেছে ওইখানে ছিল দুটো উঁচু পাহাড়। সেই পাহাড়টা কাটতে বাকি তখন।"[৮]

'প্রথম প্রহরে'র তিমুর দাদুর বয়ানে যে তথ্য পাই, তা হল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতবর্ষে রেল লাইন পাতা হয়েছিল। এরপর সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল রেল লাইনের সম্প্রসারণ। বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম রেল লাইন পেতেছিল ফ্যারিয়েল অ্যান্ড ফাউলার কোম্পানি। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল খড়গপুর রেল কোম্পানি। রেলের মাধ্যমে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাব ঘটল। আধুনিক শিল্পোদ্যোগের শুরু হল রেলকে কেন্দ্র করেই। এরপর অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেল ভারতীয় জীবন বিকাশের সঙ্গে। যদিও ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণের পেছনে ইংরেজদের ব্যক্তি স্বার্থ প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল। কিন্তু এই রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে এ দেশে আমদানি হল বিজ্ঞানের, নতুন ভাবাদর্শের শিক্ষার প্রসার ঘটল। ধর্মীয় গোঁড়ামি দূরীভূত হয়ে গ্রাম সমাজের স্থবিরতায় গতি এল। রেল পথের সূত্র ধরেই শ্রমিক শ্রেণির কলেবর বেড়ে উঠল। মধ্যযুগীয় শ্রেণিবিন্যাসের ঘটল রূপান্তর। তৎকালীন সময়ের নীচু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথম রেলের কাজে যোগ দিল। উপন্যাসে দাদুর কথায় এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে সুস্পষ্টভাবে—

"আমাদের জাত-বিচার ছোঁয়াছুঁয়ি এমনিসব অত্যাচার চলত অস্পৃশ্যদের উপর। মাদ্রাজের ওদিকে পারিয়া বলে একটা জাত আছে তাদের ছায়া মাড়ালেও নাকি বামুনদের পাপ হয়, দূর থেকে

কোন পারিয়ার মুখ দেখাও অশুভ, তাই নিজেদের পাড়া ছেড়ে বের হতে পায় না তারা, কার্জকর্মও বিশেষ কিছু করতে পায় না, জমিজমাও নেই যে চাষবাস করে চালাবে। অথচ পেটের খিদেয় যদি রাস্তায় যায় তো বামুনের চোখ পড়লেই তার উপর অকথ্য, অত্যাচার করবে। তাই রেল কোম্পানির চাকরিতে তারাই ছুটে এসেছিল সকলের আগে।"[৯]

খড়গপুরে ছত্তিশগড় থেকে শ্রমিকদের আনা হয়েছিল তৎকালীন সময়ে রেলের কাজে। অর্থের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরের পথও সেই সুযোগে সহজ হয়েছিল পাদ্রীদের পক্ষে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই অস্পৃশ্য শ্রমিক শ্রেণির শত শত মানুষ তখন খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে কোম্পানির সাহেব সুবোও পাদ্রীদের মিলিত যোগসাজশ ছিল। যার ফলে পাদ্রীদের কাজ আরও সুগম হয়েছিল। খড়্গপুরের তিনপটিয়ারা যে কারণে খৃস্টান হয়ে গিয়েছিল সকলে। কেবল তাদেরই জন্যে একটা গির্জা তৈরি করা হয়েছিল চাঁদমারির ময়দানে। লেখকের ভাষায়—"হঠাৎ একদিন জানা গেল যে যে-চাকরিই করুক খ্রিস্টান হলেই তাদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কাগজকলমে অবশ্য আইন হল না, কিন্তু পাদ্রী নিজেই তাদের বলত। আর ওরাও দেখলে, যে খ্রিস্টান হচ্ছে তারই মাইনে বাড়ছে। এমনি করে তিনপটিয়া পাড়াটাই খিস্টান হয়ে গেল।"[১০] না-শহর না-গ্রাম থেকে উপনগর হয়ে ওঠা খড়গপুর ইউরোপিয়ান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, পাঞ্জাবি, মাদ্রাজি, গুজরাতি, বাঙালি, ছত্তিশগড়ি, বিহারি মুসলমান ইত্যাদি বহুজাতির সমন্বয়ে নতুন সমাজবৃত্তে গড়ে উঠল। তৈরি হল আপাত মিশ্র সংস্কৃতির। চাকরি সূত্রেই এই বৃত্তে প্রত্যেকের অবস্থান। ফলে আত্মিক যোগ গড়ে ওঠার সুযোগ বা ইচ্ছা ছিল না কারোর মধ্যেই। এ আত্মিক সংকট পরবর্তীকালে আরো প্রবল আকার নিয়েছে। তৈরি হয়েছে মানুষের নিঃসঙ্গতা। অন্যদিকে হাজার হাজার মানুষের কুসংস্কারকেও বলি দিয়েছে রেল। রেলের মাধ্যমে যন্ত্র জাগরণের হাওয়ায় মানুষ সমাজ, ধর্ম সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই ব্যঙ্গ করে হলেও রেলকে নিয়ে গান রচনা হয়েছে—

"রেল রেল রেল
তোমার পায়ে দিই তেল

রেলের কুঠি কতদূর,

ব্যথার পায়ে তেল সিঁদুর।

এসো রেল বোসো রেল

মুখে জল বাতাসা

চালে তালে রেখো তুমি

আমার কাছারে বাছারে...

রেল রেল রেল

আমার ভাতারে দিও মুড়ি তেল।"[১১]

কিংবা

"ভক্তগণ সবে উঠে জয় জয় দিয়া।

শিষ্যগণ যার যত আয়োজন লয়া।।

কেহ কেহ আসি করে চরণ মর্দন

কেহ পদে তৈল দিয়া শান্তি করে শ্রম।।

কেহ যজ্ঞকাষ্ঠ আনি যোগায় ত্বরিতে

কেহ শান্তি জল আনি রাখে কলসেতে।।"[১২]

মানবসভ্যতার বিকাশ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও ত্বরান্বিত হয়েছে, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। পাশাপাশি ভারতবাসীকে একথাও তো স্মরণে রাখতে হয় যে অর্থের লোভে কেবল ধর্মান্তকরণ নয়, মানুষকে দেশ ছাড়া করেছে যন্ত্রসভ্যতা—আরও ব্যক্তিক আরও স্বার্থপর করে তুলেছে। ভারতের অতীতের গৌরবের সব চিহ্ন যেন ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ইংরেজদের কাছে আমরা ভারতবাসী কালো, অসভ্য, বর্বর। অথচ তারা যখন জঙ্গলে জানোয়ারের মতো বাস করত তখন সিন্ধু উপত্যকায় ভারতবাসীরা আজকের মতোই আধুনিক শহর তৈরি করেছিল। ভারতেরই স্মৃতি চিহ্ন অতীতের হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারের। কতো প্রাচীন কতো উন্নত। এসব খবর চাপা পড়ে গিয়েছিল যন্ত্রবিপ্লবের উন্নতিতে। অতীতের এই স্মৃতি গৌরব লেখকের

দৃষ্টি এড়ায় না। কেননা যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগে যন্ত্র বিপ্লবের প্রভাবে যে নতুন শহর ও মহানগর গড়ে ওঠে সেই দিকেই যাত্রা করতে থাকে সকল শ্রেণি। যে-কারণে মধ্যযুগের বিভিন্ন নগরগুলির প্রভাব ও আকর্ষণ কমতে থাকে। হয়তো এই অনুতাপ থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে আমেদাবাদের বাদাশাহি দরবারের অন্দরমহলে ছুটে গিয়েছিলেন। আমেদাবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> ''আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম, চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো-ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নিচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গল্পের।
>
> সে আজ কত শত বৎসরের কথা নহবতখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট প্রহরের রাগিণীতে; রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে; ঘোড়-সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচ্‌কাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ ঝক্‌ঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্‌ফাস্‌। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনানি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে যাওয়া গল্পের মতো—তার চারদিকে কোথাও নেই সেই রঙ, সেইসব ধ্বনি—শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।''[১৩]

যৌবনে প্রয়োজনের তাগিদেই রমাপদ চৌধুরীকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। নতুন করে গড়ে ওঠা মহানগরগুলোতেই ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা-দীক্ষা সবক্ষেত্রে অফুরন্ত সুযোগ। এ নগর শিল্প

নগর। নতুন ও পুরোনোর এই দ্বান্দ্বিক অবস্থান 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন কথাকার। জীবনকেন্দ্রিক এই দ্বন্দ্ব সময়েরই দ্বন্দ্ব। যার অভিঘাত চাঁদমারির ময়দান কিংবা হিজলীর বন থেকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে আজও। প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করে সেই সাহেব সুবোরাই। আবার এরই মাঝে শিক্ষার প্রসার, জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ, প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতবাসীকে স্বদেশী আন্দোলনে উজ্জীবিত করেছিল। যার পরবর্তীকালের ফল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। আসলে বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখেছেন কথাকার রমাপদ চৌধুরী। একজন সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিজেরে শৈশবকে নিয়ে ঘটনার ঘনঘটায় কাহিনির আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন উপন্যাসের শেষপর্যন্ত। মানুষের পৃথিবীতে গতিই একমাত্র সত্য—

> ''চক্রবৎ ঘুরছে পৃথিবী, মানুষ, সমাজ। ইতিহাস—সেও এই চক্রের আবর্তে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। কিন্তু এই চক্রের মধ্যেও উন্নতি আছে, ক্ষতিবৃদ্ধি আছে, পরিবর্তন আছে। তাই আমাদের দর্শনে সৎসঙ্গ আর সদিচ্ছা পোষণ করতে বলেছে। পরিবেশ আর প্রকৃতিধর্ম ... এই দুইয়ের প্রভাবেই মানুষ এবং সমাজ বেড়ে ওঠে। পরিবেশকে যেমন সব মুহূর্তে আমরা লঙ্ঘন করতে পারি না, তেমনি আমাদের একাগ্র ইচ্ছাকেও অস্বীকার করতে পারে না পরিবেশ। জ্ঞানের বলে, বিজ্ঞানের বলে এই চক্রবৎ প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের কাজে লাগানোই সভ্যতার সাধনা।" [১৪]

অজস্র চেনা মুখ আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসের কাহিনি এগিয়েছে স্বাধীন গতিতে। নিরুর দাদুর মুখে শোনা রেলশহর খড়গপুরের বৃত্তান্ত, খড়্গেশ্বর মন্দিরের অতীত কাহিনি, সতীর আখ্যান, ঝি ঝি পোকার ট্র্যাজেডি, অঞ্জলি দিদি ও নিমাইদার প্রণয় বৃত্তান্ত, স্বদেশী আন্দোলন এবং আলোবউ-এর হারিয়ে যাওয়া গল্পের মতো ছোটো ছোটো কাহিনিগুলো

আখ্যানকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। তবে গল্পের উপস্থাপন রীতি ও দু-একটি চরিত্রের নামকরণে পাঠকমহলে যে জিজ্ঞাসা তৈরি হয় তার প্রেক্ষিতে লেখকের বয়ান—''আমার 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসের আমি কিন্তু আমি নই, বরং তার নিরু চরিত্রে বেশ কিছুটা আমাকে পাওয়া যাবে।''[১৫] এ কথা হয়তো ঠিক যে উপন্যাসের নিরু চরিত্র আসলে লেখকেরই বাস্তব জীবন চরিত্র। পারিপার্শ্বিক নিঃসঙ্গতায় বই যার একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিরু ও তিমু মিলে প্রথম প্রহরের যে শৈশব তা যেন একক সত্তায় পরিণত হয়েছে। তাই 'প্রথম প্রহর' যেমন রমাপদ চৌধুরীর জীবনের জাগরণের প্রহর, ভারতবর্ষে রেল ও তৎকেন্দ্রীক যন্ত্রসভ্যতার প্রহর তেমনি সার্বিক অর্থে মানব জীবনের জাগরণের প্রথম প্রহরও বটে।

।।দুই।।

১৯৬১-এর আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যা সম্পাদনার কাজ শেষ করে রমাপদ চৌধুরী যখন ক্লান্ত ঠিক তখনই দূরভাষে সাগরময় ঘোষের কাছ থেকে ডাক এল—'একবার আসবেন!' পাশের ঘরে যেতেই গম্ভীরমুখে সাগরময় ঘোষ জানালেন—''উপন্যাসের নাম একটা লিখে দিন। এই সংখ্যাতেই অ্যানাউন্সমেন্ট যাবে, এখনই চাই।''[১৬] এ যেন কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম। ফলে সম্পাদকের কথা মাথায় রেখে সেদিনের রমাপদ চৌধুরী বলেছেন— ''বিয়ের ইচ্ছে আছে কি না, মেয়ে পছন্দ কি না, সে-সব যেন ধর্তব্যই নয়। হুকুম এল পিঁড়িতে বসে পড়। তারপর কাচুমাচু মুখে সাগরবাবু যা জানালেন তা কানেও গেল না। আমি তখন একদম বিভ্রান্ত। ভীত বললেও কম বলা হয়। উনি জানালেন, যাঁর উপন্যাস আরও কিছুদিন চলার কথা ছিল, তিনি বিনা নোটিশে হঠাৎ শেষ করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাকেই পরের সপ্তাহে লিখতে হবে। সে-বয়সে তাও হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু কি নিয়ে লিখব সেটাই যখন ভাবিনি, সেই মুহূর্তে উপন্যাসের নাম দেওয়া কি সম্ভব? উপরন্তু তিনি জানিয়ে দিলেন, অন্তত বছরখানেক চালাতে হবে। উপায়ান্তর না দেখে নামকরণ নিয়ে চিন্তা করছি, হঠাৎ মনে হল গ্রাম নিয়ে লিখলে তো বেশ শাখা প্রশাখা ছড়ানো যায়, একটা বছর দিব্যি টেনে নিয়ে যেতে পারব। সুতরাং গ্রাম; যা কখনও দেখিনি। নাম দিলাম 'পলাশবনীর পদাবলী', কিন্তু বাড়ি ফিরে অনুপ্রাসটা ভালো লাগল না, পরের দিন সকালে গিয়েই

তৎকালিন লাইনের মেক-আপ পেজেই বদলে দিলাম নামটা ঙ্ব এবার 'বনপলাশির পদাবলী।" [১৭]

এরপর ঠিক পরের সাপ্তাহিকে ৭ অক্টোবর ১৯৬১ থেকে ৩০ জুন ১৯৬২ পর্যন্ত 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'বনপলাশির পদাবলী'। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় জুন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম প্রকাশে পাঠকমহলে ততটা সাড়া না ফেললেও পরবর্তীকালে পাঠকদের মন জয় করে নিয়েছিল উপন্যাসটি। ধীরে ধীরে পনেরোটি সংস্করণও বেরিয়েছিল এই উপন্যাসের। দেশভাগ পরবর্তীকালের গ্রাম জীবনের চরম বাস্তবতাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন রমাপদ চৌধুরী। যদিও তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে গ্রামজীবন তার দেখা হয়নি। রেল শহরের বড়বাজার গোলাবাজারের বিরাট মাঠে চারপাশের গ্রাম থেকে যে দরিদ্র চাষী মেয়ে পুরুষ শাক সবজী এবং নানাবিধ পসরা নিয়ে বসত তাদের সঙ্গেই প্রথম একাত্মতা রমাপদ-র। এরপর নিজেকেও যেন গ্রামের মানুষদেরই একজন মনে হয়েছিল তাঁর। এমনকি তাদের অপমান পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আবার অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন—

> ''আমি গ্রাম সত্যি আজও দেখিনি। পিকনিক করার মতো মন নিয়ে নানা জেলার নানা গ্রামে গিয়েছি পরবর্তী জীবনে। আমাদের নিজেদেরও একটি গ্রাম ছিল, ... আমাদের সেই বিস্তৃত গ্রামজীবনে আমি মাত্র তিনবার গিয়েছি। কিন্তু বিভিন্ন জেলার অনেকগুলি গ্রামে বেকার জীবনের বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল। অন্তত পাঁচটি জেলার ডজন পাঁচেক গ্রামে। সেইসব অভিজ্ঞতা মিলেমিশে আমার মনে একটাই গ্রাম গড়ে উঠেছে। সেই গ্রামটির নাম বনপলাশি।"[১৮]

গ্রাম নিয়ে উপন্যাস লিখবেন এমন পরিকল্পনা ইতিপূর্বে তাঁর ছিল না। কিন্তু এবার একরকম বাধ্য হয়েই গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখায় তাঁকে কলম ধরতে হল। ৩৯ বছর বয়সে তিনি লিখলেন 'বনপলাশির পদাবলী'। উপন্যাস লেখা শেষ হলে লেখকের মনে হয়েছে ''আমি বনপলাশি গ্রামটিকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বেছে নিইনি, বনপলাশি গ্রামই যেন আমাকে তার

লেখক হিসেবে বেছে নিয়েছিল।"[১৯]

উপন্যাসটি প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিমত—"এই উপন্যাসে আমি শুধু গ্রামজীবনকে উপস্থিত করতে চাইনি। চেয়েছিলাম স্বাধীনতা পরবর্তীকালের গ্রাম জীবনের পরিবর্তীত ছবিকে পুরনো দিনের পটভূমির ওপর গড়ে তুলতে।"[২০] স্বাভাবিকভাবেই এই অভিমত আমাদের একটু ভাবিয়ে তোলে। আসলে উপন্যাসে লেখক একটা নয়, দুটো বনপলাশির কাহিনি তুলে ধরেছেন। একদিকে লেখকের সমকালীন বাস্তবের বনপলাশি, অন্যদিকে সার্বিক মানুষের মনের গভীরে স্থিত গ্রামীণ বাস্তবের বনপলাশি। সময়ের এই দ্বৈতসুরের পরিবর্তন দেখানোটাই লেখকের আসল উদ্দেশ্য। ফলে আমরা লক্ষ করব যে গ্রাম জীবনে খুঁটিনাটি বর্ণনা ও সময়ের পরিবর্তনের হাওয়ায় বনপলাশি গ্রামের নৌকো কোন পালে বইছে।

উপন্যাসের শুরু হয়েছে এইভাবে—"বনপলাশির নতুন দিঘির জলের মতই শান্ত জীবন ছিল বনপলাশি গাঁয়ের। মাঝে মাঝে দু-একটা মামলা-মোকদ্দমা, কিংবা সামাজিক অঘটন ঘটেছে বটে কিন্তু এমন চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি কখনও। এমনকি চাটুয্যেদের অবনীমোহন, যে বর্মায় গিয়ে ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছিল, সেই অবনীমোহন যেবার কলকাতায় বাড়ি করেছে খবর এল, সেবারও এমন চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি। আর মল্লিকদের বাড়ির মেজ বৌ উমাশশী সেই যে ন্যাংটেশ্বরের মেলায় গিয়ে হারিয়ে গেল, দু'বছর বাদে হৃদয় মোড়ল কাটোয়া থেকে মামলার তদবির করে ফিরে এসে সেই-যে বললে, মল্লিকদের মেজবৌকে দেখেছে তার বাপের বাড়ির গাঁ থেকে যে ছেলেটি দু-দুবার তত্ত্ব তালাশ করতে এসেছিল তার সঙ্গে, সেবারও এত চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি।"[২১] গিরিজাপ্রসাদ গ্রামে ফিরে আসছে, এই সংবাদে গ্রামে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে গ্রামে ফিরছেন গিরিজাপ্রসাদ। অনেক আশা নিয়ে বনপলাশি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষকের মহান আদর্শকে লক্ষ্য রেখে জীবন শুরু করেছিলেন, শিক্ষকতাকে ভেবেছিলেন সাধনা। সংসারের আর পাঁচজনের সাধ মেটাবার দায়ে অবসর সময়টুকুও বিলিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষকতা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয়েছে সবই ব্যর্থ। তাই নিঃস্ব জীবন নিয়ে আবার তিনি কিরে এসেছেন বনপলাশিতে। শৈশব আর যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত গ্রামে। ভেবেছেন অবসর

সময়ের বাকি দিনগুলি পুরোনো স্মৃতিকে আঁকড়ে কাটিয়ে দেবেন। গ্রামে প্রবেশের পূর্বে চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে বসে অনেক পরিবর্তন চোখে পড়েছে তার। একটা পাকা রাস্তা পর্যন্ত ছিল না বর্ধমান থেকে কাটোয়া পর্যন্ত। ''ভি.ভি.সি-র ইলেকট্রিক তারের সারি ঘাড়ে নিয়ে আকাশ ছোঁয়া লোহার থামগুলো যেন রণপা ফেলে ফেলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে গেছে—এক সারি অতিকায় দৈত্যের মত।"[২২]

গ্রামে প্রবেশের পর দেখেছেন ভি.ভি.সি-র বাঁধ তৈরি হয়েছে। ক্যানেলের মাধ্যমে চাষের জমিতে জলের বন্দোবস্ত হয়েছে। এ তো গেল বাইরের পরিবর্তন। কয়েকটা গ্রাম মিলে বনপলাশি অঞ্চলের যে নামকরণ ছিল তাও এসময় ছোটো হতে হতে একটা গ্রামের গণ্ডিতে যেন সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। পুরোনো দিনের স্মৃতি হাতরাতে গিয়ে অট্টামার ভাবনায় এই অনুতাপের প্রকাশ—''এককালে কাছাকাছি সব ক'টা গাঁ নিয়ে এই অঞ্চলটারই নাম ছিল বনপলাশি। লাল পলাশের বন্যায় নাকি ভেসে যেত সারা তল্লাট। তার থেকেই নাম হয়েছিল বনপলাশি। তারপর ধীরে ধীরে সব গ্রামেরই পৃথক পৃথক নাম হয়ে বনপলাশি নামটুকু রয়ে গেছে শুধু এই ছোট্ট গাঁয়ের অঙ্গে।"[২৩] গিরিজাপ্রসাদ সহ অনেকের ভাবনায় আপাত বাহ্যিক কিছু বদল ঘটলেও সার্বিক ইতিবাচক বদল কিছুই হয়নি। গ্রামে স্কুল নেই, হাসপাতাল নেই, নেই পচা ডোবা, মাঠের পুকুরগুলোও মজে গেছে। বাবুদের মর্জি হলে জল আসবে ক্যানেলে। তারপর আবার ধরণা দিয়ে ক্যানেলের জল নিতে হবে। পুকুরগুলো থাকতে তো জলকষ্ট ছিল না। সেচের পুকুর থেকে সবাই অবাধে জল নিতে পারতো। এখন সেই পথও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই রসিকতা করে যতে কোটাল গান গেয়েছে—

''নদী কাটলো সরকারে
তার খাজনা যোগাও দরবারে।
বলি রাজা, তুমি শুখোর বছর জল দাও না কেনে,
রাজা বলেন, মোর ঢিবির বাঁধে জল জমে নে,
জল জমে নে, গজের কাঠি মেনে।"

. . .

বলি রাজা, কলির রাজা

জল দিবে না কেনে দিব ট্যাক্সো,

রাজা বলেন, প্রেজার বেটা,

জল দিইনি, সাপ দিয়েছি একশো।”[২৪]

আসলে গ্রামের এই পরিবর্তন যতটা না বাইরের তার চেয়েও অনেক বেশি মানুষের মনের। গ্রামের প্রতিটি মানুষ ভেতরে ভেতরে শহরের আবহাওয়ার জাল তৈরি করতে থাকে নিজেদের মনে। যে-কারণে অনেকদিন আগে গিরিজাপ্রসাদ গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিলেন। তাই ফিরে এসে পুরোনো স্মৃতি সত্তায় যে শান্তির আশ্রয় তিনি পেতে চান তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। মিলিয়ে নিতে পারেন না অন্যদের সঙ্গে নিজেকে। তাই বাধ্য হয়েই আবার তাকে ফিরে যেতে হয় গ্রাম ছেড়ে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন রমাপদ চৌধুরীকে লেখা শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মত বরেণ্য পাঠকের সুতীক্ষ্ণ অভিমত—

> ‘‘তোমার ‘বনপলাশির পদাবলী’ পড়িলাম। ভাবিও না যে পদাবলী ভালবাসি বলিয়াই মোহে পড়িয়া বইখানি হাতে করিয়াছিলাম। বিশ্বাস কর, সজ্ঞানে উপন্যাস বলিয়াই বইখানি পড়িয়াছি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বইখানির প্রধানগুণ থামিতে দেয় না, একটানা পড়িয়া যাইতে হয়। প্রায় রুদ্ধনিঃশ্বাসেই পড়িতে হয়, একেবারে শেষে গিয়া ছেদ টানিতে হয়। গ্রামগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যে কারণেই হৌক পল্লীর সেই শান্ত রসাস্পদ জীবনে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, জীবন অশান্ত, তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটা কারণ,—বোধহয় শহরের হাতছানি তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। পল্লী রাখাল আর বাঁশের বাঁশিতে ফুক দিয়া তৃপ্তি পায় না। মোটর-বাস—এর হর্ণ তাহাকে ডাক দিয়াছে। পাঁচন বাড়িতে তাহার হাত উঠে না স্টিয়ারীং

ধরিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে। ধানের জমিতে গৃহস্থের দিন চলে না, তাহাকে হাস্‌কিন্‌ মেশিনের জন্য টাকা জোগাড় করিতে হয়। ... বহু আশা লইয়া গিরিজাপ্রসাদ গ্রামে আসিয়াছিল। গ্রামে সে থাকিতে পারিল না। গোপেন মড়লদের সঙ্গে তাহার বনিল না। গোরুর রাখালীতে যাহার মন বসে নাই, লক্ষ্মীমণির দৌলতেই যাহার আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে, আবার সেই লক্ষ্মীমণি যাহার জন্য বিষ খাইয়াছে, যে উদাস নিজে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে, সেই উদাসই তাহাকেগ্রাম হইতে পলাইবার সাহায্য করিল। বনপলাশির ভবিষ্যৎ কি বলিতে পার?"[২৫]

একজন পাঠকের এই প্রশ্ন রমাপদ-র উপন্যাসের বাস্তবতাকে আরও সার্থক করে তুলেছে। সেখানে বনপলাশি একটি কাল্পনিক নাম হলেও বাস্তব জীবনের সমস্যা রূপায়ণে সমগ্র বাংলার গ্রাম জীবনের প্রকৃত বনপলাশি হয়ে ওঠে। ১৯৬১-এর সময়ে দাঁড়িয়ে পূর্বের গ্রাম জীবনের হাত ধরে আজও এই প্রশ্ন ও সমস্যার যথার্থ আখ্যান হয়ে ওঠে 'বনপলাশির পদাবলী'। অবশ্য আর একটু বাড়িয়ে বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না যে, সমস্যার জাল যেন ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে ক্রমশই বিস্তৃতির দিকে যাত্রা করছে নিত্যনতুন যন্ত্রজালে।

বনপলাশির এই অনিবার্য পরিবর্তন একদিনে হয়নি। যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে শ্রমশিল্পে যে বিপ্লব ঘটল তার অভিঘাতে মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের গঠন ভেঙে গেল। এতোদিনের স্থির সমাজব্যবস্থায় গতি এল। বিজ্ঞান, ব্যক্তি স্বাধীনতা শিক্ষার প্রসার মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে দিল। গৃহকোণে বসে সুখ ভোগ করার বাসনা থেকে সবার নজর পড়ে গেল মুক্ত বাজার অর্থনীতির দিকে। বংশীর ছেলে উদাসও তাই শহরে ড্রাইভারি করার স্বপ্নে নানান বিপর্যয়কেও সহ্য করে নীরবে। শুধু বংশীকে নয়, পাঠকের উদ্দেশেই যেন অমোঘ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সে—

"কি ভাবেন সব শহুরে বাবুরা? বাউড়ি বাগদি কোটালের ঘরের ছেলেরা জীবন সার্থক মনে করবে আরও বেশি ধান ফলিয়ে?

জেলের ছেলে আরও বেশি মাছ ধরবে? ডোম আরও ঝুড়ি বুনবে?"[২৬]

গ্রাম্য তুচ্ছতা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় উদাস। সে স্বপ্ন দেখে শহরে যাওয়ার। যেখানে কোটাল বলে কেউ তাকে হেয় করবে না। সে চায় শহরে বাবুদের মতো শিক্ষিত হতে। বাবুদের মতো চাকরি করতে। আসলে এই শিক্ষিত হতে চাওয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য লুকিয়ে আছে আর্থিক স্বচ্ছলতার ওপর। বনপলাশির সমস্যা সম্পূর্ণতই আর্থিক সমস্যা। গিরিজাপ্রসাদ গ্রামে ফিরে আসছে শুনে চাঞ্চল্যের এটাই কারণ। প্রত্যেকের ভাবনায় কাজ করে যে, গিরিজাপ্রসাদ এবার অর্থ দিয়ে সকলকে সাহায্য করতে পারবে। বাড়িতে ফিরে আসার পর তাই বৈঠকখানায় রীতিমতো ভিড় হয়। প্রত্যেকের ধারণা প্রচুর টাকা নিয়ে এসেছেন গিরিজাপ্রসাদ। তাই ''চাটুজ্জ্যেদের পঙ্কে বলে, গাঁয়ে একটা লাইব্রেরি নেই, কিছু বইটই কিনে একটা লাইব্রেরি করে দিন কাকা। গোপেন মোড়ল বলে, তার আগে বরং ধুমধাম করে এবার পুজোটা লাগিয়ে দাও। নিত্য মল্লিক বলে, কাঁদরের ওপর পুল একটা বানিয়ে না দিলে বর্ষাকালে যাতায়াতের বড় অসুবিধে। ... বংশীও সায় দেয়। বলে আগে একটা দালান বানাও দিকি গিরিদাদা। শহর বাজারের মানুষ তোমরা, এ মাটির বাড়িতে থাকতে নারবে, সে আমি বলে দিচ্ছি হুঁ। কখনও বলে, একটা হ্যাজাক কেনো গো, ও লণ্ঠনের টিমটিম আলোয় পড়তে পারবে ক্যানে ছেলেমেয়েরা।"[২৭]

'বনপলাশির পদাবলী' যেন বিশেষ একটি সময়ের দলিল। সময়ের আখ্যান। নির্দিষ্ট কোনো স্থানের নয়, সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি যখন ভেঙে খান খান, গ্রামের মানুষ যখন শহরের নিওন বাতির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে নিজেকেও সেই শহরের অধিবাসী করতে চাইছে, তখনই যেন কথাকার রমাপদ তাঁর সুতীক্ষ্ণ কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সময়ের পদাবলী। তাঁর এই আখ্যান হয়ে উঠেছে মানুষ ও সময়ের অভিজ্ঞান। আখ্যানভাগের কোনো কোনো অংশ যেন পাঠক হিসাবে আমাদের মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায় তারাশংকরের 'হাসুলীবাঁকের উপকথা।' করালীর সঙ্গে উদাসের বিস্তর পার্থক্য থাকলেও কোথায় যেন একটি সূক্ষ্ম রেখা দুটি চরিত্রকে এক করে দেয়। বংশীর আপাত সাধারণ কথার উত্তরে গিরিজাপ্রসাদও

থমকে যান। যদিও গিরিজাপ্রসাদ সকলকেই সান্ত্বনা দেন কিন্তু সত্যি কথাটা বলতে পারেন না। তিনি যে বাধ্য হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছেন। এমনকি গিরীনের কাছেও সে মুখ খুলতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় দুই ভাইয়ের সম্পর্কও অনেকটা বিষিয়ে ওঠে। তার অর্থকৌলীন্যের অবস্থা বুঝে গ্রামের মানুষের ব্যবহারের বদল ঘটতে থাকে। কথায় কথায় যারা বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তি পরামর্শ নিতে আসতেন তারাও আর বৈঠকখানায় আসে না। কেবল তাকে এড়িয়ে চলে প্রত্যেকে। এরপর গিয়ে ভিড় জমায় অবনীমোহনের কাছে। অবনীমোহন সময়ের দাবিকে বুঝে আর্থিক প্রতিপত্তির দ্বারা আপন ভাগ্যকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। কলকাতায় রাতারাতি বাড়ি বানিয়ে বড়লোক হয়ে উঠেছিল। এরপর গ্রামে এলে তথাকথিত শিক্ষিত গিরিজাপ্রসাদের তুলনায় অবনীমোহনকেই বেশি গুরুত্ব দেয় গ্রামের লোক। তার কথাতেই বনপলাশিতে স্কুল বাড়ি তৈরি হয়। ফলে হেরে যাওয়া গিরিজাপ্রসাদ নয়, অবনীমোহনই হয়ে ওঠে বনপলাশির মানুষের কাছে আদর্শ চরিত্র। সকলেই বোঝে কিন্তু কোনো কিছু করার থাকে না। যেন সকলেই আটকে আছে পাকচক্রে। গিরিজাপ্রসাদের প্রশ্নে তাই বংশী বলেছিল—''একটাই পাপ গো গিরি দাদা দারিদ্দ। তাই পাপ দূর করো, সব পাপ দূর হয়ে যাবে।" [২৮] গ্রামের সকলেই অর্থকুলীনতায় বদ্ধ হয়ে আছে। স্কুল, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মধ্য দিয়ে গ্রামের উন্নতি অনেকেই চায়। কিন্তু তার জন্য স্বার্থ ত্যাগ করে এগিয়ে আসার মতো লোকের অভাব। অবনীমোহনের মতো কেউ কেউ হয়তো আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ঠিকই। আবার দায়িত্ব নেওয়ার বেলায় পিছিয়ে থাকে। যেন অর্থ দিয়েই সরে যেতে চায়।

বনপলাশির এই ধূসরতার মধ্যেও যে চরিত্র আমাদের পাঠকের মনকে ভরিয়ে তোলে তিনি অট্টামা। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে পরিবার- আত্মীয়দের সন্তান প্রতিপালনে। প্রথম যৌবনে তিনি ধর্মের জন্য, কুলমর্যাদার জন্য দাম্পত্য জীবনের সুখ বিসর্জন দিয়েছেন। জীবনে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি অক্ষয় থেকেছেন। অপরের আনন্দে নিজে আনন্দ অনুভব করেছেন। এরপরেও পরিবার কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে কোনোরকম সহযোগিতা পাননি। এই অট্টামাকে নিয়ে খ্যাতনামা সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় তার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে

লিখেছেন—

> ''সে গ্রামের পূর্ব গৌরবের স্মৃতিকাহিনী ও নিজেও অতীতের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। তাহার অনুভূতিতে বনপলাশির প্রাচীন গৌরব-গাথার অস্তমিত মহিমার অন্তিম কনককিরণে চিরসঞ্জিত আছে।''[২৯]

অট্টামাই যেন বনপলাশির প্রাচীন বৃহৎ অরণ্য। যার বিশাল চেতনায়, উদার বক্ষে সকলের স্থান মেলে। তার চেতনার শিকড় এমনভাবে প্রোথিত হয়ে আছে যা থেকে বেরোনোর ইচ্ছা বা উপায় কোনটিই তার নেই। যতদিন প্রাণ আছে বনপলাশির ভাবীকাল পর্যন্ত তিনিই যথার্থ বাহক। তাই মৃত্যুর পর কলকাতায় স্বামীর পাশে কবরস্থ হওয়ার বাসনাও ত্যাগ করার সিদ্ধান্তে অনড় অট্টামা বলেন—

> ''এ গাঁ ছেড়ে কোথায় যাবো রে? এ গাঁ ছেড়ে যেতে মনে করে কারো? এই গাঁয়ে জন্মেছি, এই গাঁয়ে বিয়ে হয়েছে, ... কত কি দেখলাম... ভাসুরের ছেলেমেয়েদের মানুষ করলাম, ... বিয়ে দিলাম... এ গাঁয়ের সঙ্গে যে সব মাখামাখি হয়ে আছে রে আমার। ... ভাসুরপোরা আজ আর খবর নেয় না, কিন্তু তারা সেই ছোট্টটি হয়ে আমার কোলে হাসছে। ... যারা যাবার তারা যাবেই, তবু বনপলাশি থাকবে...। কত নতুন মানুষ আসবে, ইস্কুল হবে, ডাক্তারখানা হবে, কত কি দেখলাম, বাকিটা দেখব না...।''[৩০]

অট্টামা যেন সময়ের সাক্ষী হয়েই থেকে যান বনপলাশিতে। সরোজ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন—

> ''এই উপন্যাসের ধুতিময়ী চরিত্র অট্টামা। প্রবাদময়ী আলাপনীতে অট্টামা অবিস্মরণীয়। ... অট্টমা নিজেই যেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংহতি ভারতী প্রতিমা। ... নির্দন্তী, ছিন্নকাথায় ঢাকা এই নারী সেই বিরল মন্ত্রের অধিকারিণী যার সম্মুখে সব বন্ধুরতার অবসান।''[৩১]

অট্টামা চরিত্রের পাশাপাশি আর একটি চরিত্রের কথা না বললেই নয়, তিনি মোহনপুরের বউ। অসাধারণ দক্ষতায় রমাপদ এই চরিত্রটিকেও নির্মাণ করেছেন। অত্যন্ত শান্ত স্থির, দৃঢ়চেতা মোহনপুরের বউয়ের মধ্যে ঈর্ষা আছে, হিংসা আছে, স্বার্থপরতাও আছে। কিন্তু এসবই সাময়িক। তার এই যৎসামান্য ত্রুটিগুলিকে ছাপিয়ে গেছে তার মহানুভবতা।

> ''ঘোমটার ভিতর হইতেও এই শান্তশিষ্ট মেয়েটির মুখের
> ঔজ্জ্বল্য বনপলাশির পদাবলীকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।''[৩২]

স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থার ভাঙনের মূলে বিশ্ব পুঁজিবাদ। যার হাতছানিতে বনপলাশির প্রায় সকলেই গা ভাসিয়ে দিতে চেয়েছে। সেখানে প্রত্যেকেরই একটা উদ্দেশ্য অর্থ-প্রতিপত্তি। এই পরিবর্তন মানুষের অন্তর্নিহিত শোভাকেও প্রায় নিঃশেষ করে দিতে চলেছে। পুঁজিতেও আজ আর কিছু হয় না। একটা অদৃশ্য সুতো প্রতিনিয়ত গ্রামের সমাজজীবনে জড়িয়ে আছে। পরিবর্তনই যার অন্য নাম। এই পরিবর্তনের পাকেচক্রে রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশির পদাবলী' সমাজ ও সময়েরই ধারকমাত্র।

।। তিন ।।

১৯৭৪ (১৩৮১) খ্রিস্টাব্দে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'খারিজ'। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৪। 'খারিজ'-এর পরিকল্পনা সম্পর্কে লেখক উল্লেখ করেছেন — ''উপন্যাসটি লেখার পনেরো বছর আগে একবার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ফায়ার ব্রিগেডের পিছনে করোনারের কোর্টে গিয়ে এক বালক ভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যুর সাক্ষ্যপ্রমাণ ও করোনারের রিপোর্ট শুনেছিলাম। ব্যাস। ঘটনাটি পনেরো বছর মাথার মধ্যে ছিল; ইচ্ছে ছিল নাটক লেখার। শেষ অবধি উপন্যাসই লিখে ফেললাম। লিখতে সময় লাগে পনেরো দিন।''[৩৩]

পনেরো বছরের পুরোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পনেরো দিনে লেখা 'খারিজ' উপন্যাস সেদিন পাঠক মহলে অভাবনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এরপর কেরলের 'কুঙ্কুম' পত্রিকায় মালয়ালম অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ভাষাতেও উপন্যাসটি অনূদিত হয়েছে।

বইটির ইংরেজি অনুবাদ 'নাথিং বাট দি ট্রুথ'। তাছাড়া মূল উপন্যাসটি প্রকাশের আট বছর পর মৃণাল সেন 'খারিজ'-এর চিত্ররূপ দেন ১৯৮১ সালে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি সম্মানিতও হয়। এতো জনপ্রিয়তা লেখকের মনে কিছুটা সংশয়ের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছে উপন্যাসের উদ্দীষ্ট বিষয় বোধ হয় অনেক পাঠকই বুঝে উঠতে পারেননি। যে-কারণে উপন্যাসের প্রসঙ্গকথায় তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন —

> ''কেউ ভেবেছেন এটি একটি বাচ্চা চাকরের গল্প, আরো ভালো মাইনে এবং শোয়ার ভালো বিছানা কিংবা খাওয়ার কথা বলেছি। কেউ ভেবেছেন আমরা মধ্যবিত্তরাও মানুষ, কিন্তু অসহায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। গোটা সমাজের সার্বিক বিশ্লেষণে ঘটনা এবং তার কার্যকারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে যুথবদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের আকৃতি, প্রকৃতি এবং চরিত্র উদ্ঘাটন এবং তারই মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রকে চিরে চিরে দেখার আত্মসমালোচনাই এর উদ্দেশ্য ছিল।''[৩৪]

ফলে আমরা অতিসহজে বুঝে নিতে পারি যে মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ মানসিকতা, নিরাপত্তার অভাব বোধ এবং তার কূপমণ্ডুকতাকে আক্রমণ করাই লেখকের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য। ''ইট ওয়াজ এ কেস অফ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল অ্যাকসিডেন্ট। অ্যান্ড হেন্স দি কেস ইজ ক্লোজড্।''[৩৫] পনেরো বছর আগে শোনা এক বালক ভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাকে সেদিনের আদালত সাধারণ ঘটনা বলে উল্লেখ করলেও তাকে ঘিরে নতুন করে যেন কেস ফাইল করলেন রমাপদ চৌধুরী। নাম দিলেন 'খারিজ'।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র জয়দীপের আত্মকথনে কাহিনির শুরু। জয়দীপ ও অদিতি একালের বঙ্গসন্তান। দু'জন দু'জনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর কলকাতার কোনো এক গলিতে নটবর রায়ের বাড়িতে একতলার সংক্ষিপ্ত আশ্রয়ে দুজনের সংসার জীবন শুরু। শুরুটায় দুজনে সংসারের জমাখরচ মেলাতেই অস্থির। ঝি, চাকর, রান্নার লোক রাখার মতো বিলাসিতার

কথা ভাবতেই পারত না।

> ‘‘কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতে দু’দুটো লিফট হল। একটা অফিসে আর একটা সংসারে। অদিতি মা হল। কাজ বাড়লো তখন থেকে। আরো বাড়ল টুকাইকে স্কুলে ভর্তি করার পর। অদিতির তখন একটাই বায়না। . . . আমি সোনা চাই না, রূপা চাই না, আমি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার চাই না, লাক্সারি ফ্ল্যাট চাই না, আমি শাড়ি, গাড়ি, ফ্রীজ, রেডিওগ্রাম চাই না, কালো টাকা রাখার জন্যে ব্যাঙ্কের লকার চাই না, আমি শুধু একটা বালক ভৃত্য চাই।’’[৩৬]

জয়দীপের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে এবার প্রয়োজন হল একটি বালক ভৃত্যের। বালক ভৃত্য কেন? কারণ বাচ্চাগুলো খুব চটপটে হয়। কথা শোনে। ফাইফরমাশ করা যায় তাদের। অবশ্য দুটো ছেলে জুটেওছিল, এরমধ্যে আবার নাকি একটা পালিয়েও গিয়েছিল। এরপর অবশেষে এল পালান। বারো বছরের শান্তশিষ্ট একটি ছেলে। রোগা চেহারা, লাজুক লাজুক মুখ। অজ পাড়া গাঁ থেকে এসেছে। চোখে তখনো দাম শ্যাওলার আভা, মুখে নিকানো উঠোনের ঠাণ্ডা প্রলেপ। ছেলেটাকে ভীষণ ভালো লেগেছে অদিতির। ঠিক এইরকমই যেন একটা বাচ্চা ছেলে চেয়েছিল অদিতি। পছন্দমতো বালক চাকর রেখে তার কী আদর — হাড় কাঁপানো শীতে শুধু একটা পুরোনো শতরঞ্জির মতো পাতলা তোষক পেতে, ছেঁড়া চাদর গায়ে জড়িয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে শুতে হয়েছে তাকে। শেষে এক শীতের রাতে বদ্ধ রান্নাঘরে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে পালানের। গ্রামে অভাবের সংসারে তার বাবা খেতে দিতে পারে না, তাই কলকাতায় এনে অন্যের বাড়িতে কাজে ঢুকিয়ে দেয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অবশ্যম্ভাবী ফল গ্রাম জীবনের ভাঙন। গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কখনো শিক্ষা ও আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে মানুষ শহরে ছুটে এসেছে। ‘বনপলাশীর পদাবলী’ উপন্যাসে মানুষের শহরমুখী প্রবণতায় তারই ছাপ লক্ষণীয়। আবার খেতে না পাওয়া হতদরিদ্র পালানের পিতার মতো মানুষেরাও শহরমুখী হয়

সামান্য কাজের জন্য, পেটের দায়ে। সামান্য অর্থের লোভে বালক পুত্রকে অন্যের বাড়িতে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য শহরে নিয়ে আসে। অদিতির কাছে পালানের বাবা বলে —

> ''বড় আকাল যাচ্ছে মা, ঘরে ভাত নাই। আপনার ইখানে চাট্টি খেতে পাবে, মাইনা পাবে। . . . টাকার নেগেই তো আসা . . . মা নাই একফোঁটা ছেলে, টাকার নেগেই তো আনলাম।''[৩৭]

চাহিদা এবং আমদানির যথার্থ বাজার দরে পালানের আশ্রয় ও জীবিকা মিলে গেল। আবার সুলভ মূল্যে জয়দীপেরও যথার্থ চাকর জুটল। কিন্তু এরপর পালানের অস্বাভাবিক মৃত্যু জয়দীপ ও অদিতির কাছে ভয়ংকর হয়ে উঠল। সকালের এমন অভাবনীয় মুহূর্তে সবকিছুর তালগোল পাকিয়ে যাওয়ারই কথা। যেমনটি হয়েছিল জয়দীপের — ''থানা-পুলিশ, কোর্টঘর, আইন, পাড়াপড়শির মন্তব্য . . . সবকিছুই একটা তালগোল পাকিয়ে আমাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল।''[৩৮] এই পরিস্থিতিতে নটবর রায় হয়ে উঠল তার আপাত একান্ত ভরসার স্থল। যাকে প্রতিনিয়ত কেবল নটবর বলে তুচ্ছাতাচ্ছিল্য করে এসেছে তারা। মৃত পালানের বুকে পিঠে হাত দিয়ে জয়দীপের মনে হয়েছিল যেন বেঁচে আছে। তাই দ্রুতগতিতে ডাক্তার বাগচিকে ডাকার জন্য ছুটে গেল। ফিরে আসার পথে নিজেই নিজেকে নিয়ে ভাবে —

> ''আমি বোধহয় অভিনয় করছি। ডাক্তার ডেকে এনে নিরপরাধ সাজতে চাইছি। কাল রাত পর্যন্ত ওর ওপর আমার মায়ামমতা ছিল ঠিকই, ওকে একটা সোয়েটার কিনে দিতে হবে বলে অদিতির সঙ্গে পরামর্শ করেছি। কিন্তু আজ ও আমাকে বিপদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বলেই সত্যিকারের কোন মায়ামমতা আজ তার নেই। ওকে বাঁচানোর জন্যে আমার যদি প্রবল আগ্রহ থাকতো তাহলে প্রথমেই দরজাটা ভেঙে ফেলিনি কেন! আসলে আমি বোধহয় সাক্ষী চাইছিলাম একজন। কারণ নিজেকে বাঁচানোর কথা ভেবেছিলাম।''[৩৯]

জয়দীপের এই আত্মকথন মধ্যবিত্তের পলায়ন প্রয়াসেরই নামান্তর। আত্মরক্ষার ভিন্ন পথ অনুসন্ধান। পালানের মৃত্যুর দায়ভার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে কখনো অদিতি, কখনো পালানের বুড়ো বাপ, কখনো পালান আবার কখনো বা বাড়িওয়ালা নটবর রায়ের ওপর দায় চাপিয়ে দিতে চায়। পালানের অশিক্ষা ও বুদ্ধিহীনতার পাশাপাশি তার বুড়ো বাপকে দায়ী করে জয়দীপ বলেছে—

> ''যেন তার নিজের কোন দায়িত্ব নেই। আমি তো আমার প্রয়োজনের জন্যে একটা বালক ভৃত্য চেয়েছিলাম। কিন্তু বুড়োটাই তো আসলে দায়ী, মাসের মাস কুড়ি টাকার লোভে সে কি বাচ্চা ছেলেটাকে দিয়ে যায়নি? জিলিপি খাইয়ে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেনি?''[৪০]

আসলে এর জন্য দায়ী কে বা কারা! পালানের বুড়ো বাপ, জয়দীপ, অদিতি, বাড়িওয়ালা রায়বাবু, পালান না অর্থনৈতিক সমাজ পরিকাঠামো। দায়ভার যারই থাকুক, ঘটনা যেহেতু ঘটে গেছে জয়দীপের বৃত্তে কাজেই তাকে এড়িয়ে যাওয়ার শতচেষ্টা করলেও এর দায়ভার তো এড়ানো যায় না। কাজেই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জয়দীপের স্বস্তি ছিল না। জয়দীপ স্বস্তি পেল সেইদিন যে দিন করোনার কোর্টের রায় বেরোল — ''ইট ওয়াজ এ কেস অফ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল্ অ্যাকসিডেন্ট। অ্যান্ড হেন্স দি কেস ইজ ক্লোজড্।''[৪১] ফাইল বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামলা খারিজ হল কিন্তু জয়দীপের মধ্যে যে অনুতাপ সৃষ্টি হয়েছিল পালানের মৃত্যুতে, এরফলে ক্রমশ তার মনে যে বিকার দেখা দিয়েছিল তা শেষপর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিচারকের রায় তার কাছে তাই উপহাসের মতো মনে হল।

প্রকৃতপক্ষে জয়দীপ চরিত্রের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের দ্বান্দ্বিকতাকে মনোবিকারের আয়নায় তুলে ধরতে চেয়েছেন রমাপদ চৌধুরী। পালানের মৃত্যুতে তার মনোবিকার তারই পরিচায়ক। জয়দীপের মধ্য দিয়ে তথাকথিত মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে উদ্ভাসিত। ধীরে ধীরে লেখক আখ্যানের মূল উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সমাজ অর্থনীতির বৃত্তে মধ্যবিত্তের অনিশ্চয়তা, একাকীত্ব, ভয় মুহূর্তে জয়দীপ ও নটবর রায়কে এক করে তোলে। বাড়িওয়ালা ও

ভাড়াটিয়ার ব্যবধান আপাত নিষ্পত্তির কারণে ঘুচে যায়। ভেন্টিলেটার না থাকার দায় এড়ানোর জন্যে বাড়িওয়ালা নটবর রায় জয়দীপের সঙ্গে মিশে যায়। আর তাই নটবর রায় হাসতে হাসতে বলে —

> ''বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে এসব তো বানানো পরিচয় মশাই,
> আসলে আমরা তো একই ক্লাস।''[৪২]

আসলে মধ্যবিত্ত মূলত একটি মানসিকতার নামান্তর। যন্ত্রসভ্যতার হাত ধরে বর্ণ বিভাজনের জায়গায় যে শ্রেণি বিভাজন তৈরি হল, তাতে না ধনী, না দরিদ্র এর মধ্যস্থলে অবস্থান হল মধ্যবিত্ত মানুষের। কালের গতিতে ক্রমশই বেড়ে চলেছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিসর। বেড়েছে সংকট ও দ্বান্দ্বিকতার নিত্যনতুন মুদ্রাদোষ। ফলে নিজেরই মুদ্রাদোষে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনের তাগিদে একই স্থলে অবস্থান করার প্রবণতা, এই শ্রেণি বিড়ম্বনার অসংগতি উঠে আসে জয়দীপের আত্মকথনে —

> ''এতো দুর্ভাবনার মধ্যেও এক এক সময় আমার হাসি পেয়ে যায়। নিজেকে চিরে চিরে দেখতে ইচ্ছে করে। মর্গে, পালান, তোকে যে ভাবে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে ফালা ফালা করে দেখেছে, ঠিক তেমনি করে নিজেকে কেটে ছিঁড়ে আমি দেখতে চাই। তুই পাড়া গাঁয়ের গরীব ঘরের একটা দুর্বল অসহায় বালক, ভেবেছিলি মরে গিয়ে দুই দৈত্যের মতো অসীম শক্তি পেয়ে গেছিস তোর হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু, দেখ দেখ, স্বার্থ কি জিনিস? সবাই ভাবত রায়বাবু আর আমার মধ্যে একটা বিভেদের পাঁচিল, কেউ ভাঙতে পারবে না। আমি ভাবতাম, অদিতি ভাবত, রায়বাবু বাড়িওয়ালা, ও তো বড়লোক। আর আমরা দুশো টাকার ভাড়াটে, মধ্যবিত্ত চাকুরে মানুষ। আমরা পরস্পরের শত্রু। কিন্তু দেখ দেখ, আমরা কেমন এক হয়ে গেছি।''[৪৩]

জয়দীপের অফিসের সহকর্মী রাধানাথও এসে হাত মেলায় তাদের সঙ্গে যেন জয়দীপের শক্তি ও সাহস বাড়াতে, মধ্যবিত্তের গণ্ডিকে আরও বাড়িয়ে রাধানাথ বলে, ''ঐ বাচ্চা ছেলেটা, পালান না কি নাম, ও মরে গিয়ে এখন একা লড়ছে আর আমরা সবাই একদিকে, কারণ আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, পরস্পরকে চিনি, যেমন করে পারি খুঁজে বের করি। ডাক্তার, উকিল, ইনফ্লুয়েন্স সব তো আমাদের দিকে।"[৪৪] মধ্যবিত্তের এই সংখ্যাবৃদ্ধি জয়দীপকে বাইরের দিক থেকে আপাত শান্তি দিলেও তার অন্তরাত্মাকে পালান শ্মশানে গিয়েও শান্তি দেয়নি। পাগল করে তুলেছিল তাকে। উপন্যাসের একটি উন্মাদ চরিত্রের সংলাপ জয়দীপেরই অন্তরাত্মার বহিঃপ্রকাশ। আখ্যানে দেখানো হয়েছে, বিচারককে উপেক্ষা করে দর্শকদের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজন উন্মাদ লোক লাফিয়ে ওঠে তারস্বরে চীৎকার করতে থাকে —

> ''আমি অনেকক্ষণ চুপ করে আছি, আমরা অনেককাল থেকে চুপ করে আছি। কিন্তু এখন আর আমি চুপ করব না। কারণ একজনও এখানে সত্যি কথাটা বলছেন না। বাট ট্রুথ মাস্ট কাম আউট। দেশের দরিদ্রদের কথা, আর্থিক অবস্থার কথা আপনারা কেউ বলছেন না। কেন ঐ বুড়ো লোকটিকে মাত্র কুড়িটি টাকার জন্যে তার একমাত্র ছেলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে হয়েছিল? কেন? কেন ছেলে মেয়ের মুখে ভাত তুলে দেওয়ার সামর্থ্য নেই ঐ বৃদ্ধের? যে বয়সে ঐ ছেলেটির নিজেরই স্কুলে যাবার কথা, সে বয়সে কেন তাকে সান্যাল দম্পতির পুত্রের স্কুল ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে হয়? কেন ঐ জয়দীপ সান্যাল ও অদিতি সান্যাল তাদের ভৃত্যটিকে ভাল মাইনে দিতে পারে না? কেন তাকে গরম বিছানা কিংবা শোবার জায়গা দিতে পারেন না? অদিতি সান্যাল বিশ্বনাথ নামের যে ভৃত্যটিকে দায়ী করতে চেয়েছিলেন, কেন সে ঐ অতটুকু বয়সে ঘড়ি, আংটি টাকা চুরি করতে বাধ্য হয়?"[৪৫]

উন্মাদ লোকটির বয়ানের মধ্য দিয়ে রমাপদ চৌধুরী চলে যান সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। যে সমাজ, অর্থনীতির চক্রব্যূহে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের প্রতিটি মানুষ আটকা পড়ে আছে। এরই মধ্যে কেবল মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের নিজেদের অসহায়তা, অনিশ্চয়তা ও একাকীত্বকে দায়ী করে। নিজেদের আত্মসমালোচনা করে — ''মধ্যবিত্ত মানুষগুলো কি ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল। বড়লোকদের মতই। বিশ্বচরাচরে, কোথায় কি অনাচার অবিচার চলছে সে বিষয়ে সবসময় সচেতন, শুধু নিজের গৃহকোণটির বেলায় একেবারে অন্ধ।''[৪৬] এই অন্ধকারে ডুব দিয়ে জয়দীপ চরিত্রের চেতনাপ্রবাহকে তুলে ধরে উপন্যাসের গতি দান করেছেন লেখক। পালানের মৃত্যুর পর বিভিন্ন ভাবনার সঙ্গে জয়দীপের স্মৃতিতে একসময় উঠে এসেছে অদিতির বন্ধু শ্যামলীর প্রেমকথা। অদিতির সঙ্গে প্রেমের অন্তহীন গাঢ়তম মুহূর্তে শ্যামলী এসেছিল জয়দীপের কাছে। আবার সরেও গিয়েছিল বিনম্র দ্বিধায়। কিন্তু এই শ্যামলীকেও কি বুঝতে পেরেছিল জয়দীপ? হয়তো বুঝেছে, অসময়ে। শ্যামলীর ভালোবাসার অপমৃত্যু যেন জুড়ে গেছে পালানের অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে। জয়দীপের অবহেলা ও অবজ্ঞাই এর জন্যে দায়ী। আত্মকথনে জয়দীপের মধ্যে তা-ই উচ্চারিত হয়েছে,

> ''. . . মনে হল, আমার অবহেলাও তো আরেকটা মৃত্যুর জন্য দায়ী—। একজনের নিঃশব্দ গোপন ভালোবাসাকেও তো চোখ মেলে দেখতে চায় নি একদিন, নিতান্ত অবহেলাতেই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম।''[৪৭]

আসলে পালানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রমাপদ চৌধুরী যে আখ্যান রচনা করেন, তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে মধ্যবিত্তের পলায়ন প্রয়াস। যতই সে পালাতে চায় ততই যেন অপরাধবোধে জর্জরিত হতে থাকে। আবার এই অপরাধবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির পথও খুঁজে। কিন্তু শেষ অবধি ফাঁকি দেয় নিজেকেই। সেদিক থেকে মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতারণা এবং নিষ্ফল আত্ম-পরিত্রাণের আখ্যান 'খারিজ'।

সময়ের জালে প্রতিটি মানবিক সম্পর্ক পাল্টে যাচ্ছে। দ্রুত বদলাচ্ছে মূল্যবোধের স্বাভাবিক মাত্রা। অস্থির এই সময়ের প্রেক্ষণবিন্দুতে সজীব প্রাণ সেই প্রথম প্রহরের শৈশব। টুকাই

আর পালানের আন্তঃসম্পর্ক উপন্যাসে তারই পরিচায়ক। ঘটনা ও কাহিনির জটিল আবর্তে এই দুটি চরিত্রের চলাফেরা আমাদের নজর কাড়ে না। হয়তো না বুঝে এড়িয়েও যায় পাঠক। বাইরের এই জটিল আবর্তগুলো তাদের স্পর্শ করে না। সবকিছু উপেক্ষা করে দুই অসমবয়সী বালক মিশে যায় নিজেদের জগতে। পালান স্কুলে না পড়লেও টুকাইয়ের বই ভর্তি স্কুল ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাওয়ায় সে গর্ব বোধ করে। বাধ্য ছাত্রের মতো টুকাইয়ের সামনে আসন পেতে বসে থাকে। আর টুকাই টিচার সেজে পালানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অঞ্জন হোয়ের ইজ দ্য গার্ল নাও?' পালান কিছু না বুঝেও হাসে আনন্দ উপভোগ করে। পালানের মৃত্যু জয়দীপ ও অদিতিকে দুঃশ্চিন্তায় ফেললেও শোকাবহ করে তোলে। এই কঠিন সত্যের বিপরীতে শৈশবের সমস্ত সরলতা নিয়ে একলা টুকাই। সে জানে না, মৃত্যু কী? তাই পালানকে নিথর শুয়ে থাকতে দেখে জানতে চায় 'পালানের কি অসুখ হয়েছে?' এই প্রেমহীন যান্ত্রিকতার সময়ে 'শৈশব মুহূর্তটাই একমাত্র খাঁটি'। আর সব বদলে যায়। কিন্তু অতীত স্মৃতিচারণ ছাড়া বাস্তবে তো ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। জয়দীপের কাছেও এটা স্পষ্ট। তবুও সময়ের জীবনবৃত্তান্তে তার সন্ধান তো চলতেই থাকে। রমাপদ চৌধুরী যেভাবে খুঁজতে চেয়েছেন টুকাইয়ের কথার মধ্য দিয়ে, 'অঞ্জন হোয়ের ইজ দ্য গার্ল নাও?'

।।চার।।

'খারিজ' (১৯৭৪) এর পর 'লজ্জা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৭৫ (১৩৮২)। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬ (১ বৈশাখ ১৩৮৩)। 'লজ্জা' হিন্দি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। অনুবাদক বিমল মিশ্র। রমাপদ চৌধুরীর প্রায় গল্প ও উপন্যাসের পেছনে থাকে বাস্তব, ব্যক্তিগত কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি। 'লজ্জা'-এর ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন — ''আমার যাতায়াতের পথে একটি হাসপাতাল, মানসিক ভারসাম্য হারানো রোগীদের। একদিন চোখে পড়ল কিশোরী সুশ্রী চেহারার একটি মেয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে উন্মাদের অর্থহীন দৃষ্টি, ধীর কণ্ঠে বারবার বলছে, 'দইওয়ালা, ও দইওয়ালা একটু দই দিয়ে যাও না।' আরেকদিন চোখে পড়ল কয়েকজন

আত্মীয় বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠছে আর হাসপাতালের জানালায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উন্মাদিনীর মত একজন বিবাহিতা মহিলা বলছেন, বাবা, তুমি আমাকে পাগলাগারদে রেখে গেলে? মিস্টার চ্যাটার্জি, আমার স্বামী, তুমি আমাকে পাগলাগারদে রেখে যাচ্ছ? আমি পাগল নই, পাগল নই। পাগল তোমরা। এই দুটি দৃশ্য বহুদিন স্মৃতির মধ্যে ঘুরেছে। এ দুটি দৃশ্যই উপন্যাস লিখতে বাধ্য করেছিল। না, সেই মহিলার বাবা এবং স্বামীর চোখে যে বিরক্তি এবং লজ্জা দেখেছিলাম, আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম বলে, সেই বিরক্তি এবং লজ্জাই এ উপন্যাস লিখতে বাধ্য করেছিল।"[৪৮]

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উল্লিখিত দুটি দৃশ্যই অপরিবর্তিতভাবে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। চোখে দেখা এই দৃশ্য দুটোকে কেন্দ্র করে যে জীবন ভাবনায় রমাপদ চৌধুরী পৌঁছে যান তা অনবদ্য। উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরা যেন পাঠককে মুখ ফেরানোর কোনো অবকাশ দেয় না। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে ধরে রাখে। উপন্যাসটি পড়ে ঋত্বিক ঘটক স্বয়ং লেখককে দূরভাষে জানিয়েছিলেন —

> "বলার বাইরে। দারুণ, দারুণ লিখেছেন — লজ্জা।... খারিজ ভালো লেগেছিল, ডেফিনিটলি খুব ভালো লেখা, কিন্তু 'লজ্জা'-র মধ্যে একটা ফাইনার ব্যাপার আছে।... একটা স্ক্রিপ্ট করব, চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে স্ক্রিপ্ট করতে বেশ মজা লাগে। হাসতে হাসতে বললেন, না না, বাতলামি করছি না, সত্যি ভালো লেগেছে।"[৪৯]

একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হলেও তার ব্যঞ্জনা বৃহত্তর তাৎপর্যের দিকে এগিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে —

> "একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে এর কাহিনি, কিন্তু লজ্জা আদৌ কোনো পারিবারিক উপন্যাস নয়। এটি মানসিক ভারসাম্য হারানো মানুষের গল্পও নয়। আসলে মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্ত

জীবনটাই যেন সবকিছু গোপন করার চেষ্টায় অতিবাহিত হয়। তার অভাব অনটনই শুধু সে গোপন করে না। গোপন করতে চায় চরম দুঃখকেও। সবকিছুতেই তার লজ্জা! বিছানার চাদরটা নোংরা রাখায় তার লজ্জা নেই, বাইরের কেউ দেখে ফেলবে, অতএব অতিথিকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ঝটিতি সেটা বদলে ফেলা চাই। ছেলের রেজাল্ট, মেয়ের বয়স থেকে শুরু করে জীবনের সর্বত্র শুধু গোপন কর আর গোপন কর।"[৫০]

শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসা একটি অপ্রকৃতিস্থ মেয়েকে নিয়ে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়, উপন্যাসটি পড়লে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পরিবারের সকলে যেন মেয়েটির সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারে না। আর এভাবেই কখন সে পরিবারের একজন নিজের মানুষকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দেয় তাও হয়তো তারা বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু এই অপ্রকৃতিস্থ মেয়েটিকে যখন পাগলাগারদে রেখে আসতে হয়, তখনই অনুতাপে অনুশোচনায় দগ্ধ হয় পরিবারের নিজেরা। এই ফাঁকি তো তাদের পলায়নবৃত্তির অন্য নাম। 'খারিজ' উপন্যাসের সঙ্গে 'লজ্জা'কে মেলানো যায় না বটে, কিন্তু দুটো উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু মধ্যবিত্ত জীবনবাস্তবের আখ্যান একথা আমরা ভুলি কি করে। এদিক থেকে দুটি উপন্যাসকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। তবে জয়দীপের মনোবিকার ও আত্মবিশ্লেষণ তাকে যেভাবে তাড়িত করেছে অনিমেষ সে জায়গায় একটু আলাদা। মধ্যবিত্তের অবস্থানগত দিক থেকে দুটো চরিত্র এক হলেও আত্মবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জয়দীপের থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম হয়ে ওঠে অনিমেষ।

মফস্বলের সাধারণ পরিবারের ছেলে অনিমেষ। একমাত্র পড়াশুনার জন্যে কলকাতায় এসেছে। এরই সূত্র ধরে দূর সম্পর্কের বাণী পিসিমার বাড়িতে তার থাকার জায়গা স্থির হয়। গ্রামের ছেলে হওয়ার কারণে প্রথমদিকে অনিমেষ নিজেই খুব একটা স্বচ্ছন্দবোধ করতে পারে না। সারাক্ষণ তার ভেতরে একটা অস্বস্তিবোধ কাজ করে। সাজানো গোছানো বাড়ি, জানালায় জানালায় সুন্দর সুন্দর পর্দা এসবের মধ্যে নিজেকে যেন বেমানান লাগে। তার এই সংকোচ কাটল কিছুদিন পর।

ক্রমশ সহজ হয়ে এলে বাড়ির ছোটো বয়সের টুনটুন ও বাবুলকে পড়ানোর দায়িত্ব সে নিজেই কাঁধে তুলে নেয়। কোনো বন্ধুকে বাড়িতে আসার কথা বলে না, পাছে পিসেমশাই কিছু মনে করেন কিংবা বিরক্ত হন এই ভেবে। বাণী পিসিমার বাড়িতে অনিমেষ আশ্রিত। শুরু থেকেই এই ভাবনা তাকে তাড়িত করে। আবার সুবিধে অসুবিধে অনেক ক্ষেত্রে পিসিমা তাকে কাছে টানলেও পরিবারের প্রকৃত সংকটে অনিমেষ কেবলই বাইরের লোক। তাকে বাইরের লোক বলেই বিবেচনা করা হয়। তাই শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসা অপ্রকৃতিস্থ রেণুর সুস্থতার প্রমাণ দিতে অরুণের সামনে তাকেই প্রথম ডাকা হয়। তার সাক্ষ্যে পিসেমশাই প্রায় মামলা জেতার ভঙ্গিতে বলে ওঠেন —

> ‘‘নাও লুক, সত্যি যদি তেমন কিছু থাকতো, আমরা বাড়ির লোক, বলতে পার লক্ষ করিনি, বাট হি ইজ অ্যান আউটসাইডার, ওর নিশ্চয় চোখে পড়ত।’’[৫১]

আউটসাইডার বলেই হয়তো কলেজ থেকে ফিরে অন্যদিনের থেকে বাড়িটা একটু থমথমে লাগলেও আসল ঘটনা বুঝতে তার অনেক সময় লাগে। তার উদ্বেগ, কৌতূহলের অবসান হল পিসেমশাইয়ের কথায়। বাড়ির মেয়ে রেণুর চরিত্রে কিছু অসংগতি দেখা গেছে। তাই তার স্বামী তাকে বাবার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। এই অস্বাভাবিকতা নাকি একধরনের ইনস্যানিটি। রেণুর অস্বাভাবিকতার কথা এবং পরিবারের মধ্যে নিজের অবস্থান বুঝতে পেরে ভেতরে ভেতরে অভিমান ও ক্ষুব্ধ হয় অনিমেষ। কান্নায় ভেঙে পড়ে আত্মকথনে বিড়বিড় করে বলে —

> ‘‘আমি একজন আউটসাইডার। বাইরের লোক। . . . বাণী পিসিমা, তোমরা কি গো, এখনো আমাকে বাইরের লোক ভাব। তোমার যখন ঠাকুর-চাকর পালিয়েছিল, শীতকালের সকালে উঠে আমি তোমার কয়লা ভেঙে দিয়েছি। একবার বাবুলের অসুখের সময় আমি তার মাথায় আইস ব্যাগ ধরে রাত কাটিয়েছি, তুমি আর সে-রাতে জেগে থাকতে পারছিলে না। আমি

আউটসাইডার, আমি বাইরের লোক, আমাকে শুধু অরুণদার সামনে সাক্ষী হিসেবে ডাকা যায়। আমাকে সাবধান করে দিতে হয় যাতে বাইরে না রাষ্ট্র করি। বাণীপিসিমা, তোমরা যদি জানতে রেণুকে আমি কতখানি ভালোবাসি। 'ইনস্যানিটি' কথাটা আমার বুকের মধ্যে ছুরির মত বিঁধে গেছে, তোমরা জান না। আমার বাবা-মাকে তোমরা চেন না, চিনতে পার নি। তাই তোমাদের এতো ভয়। তোমার সংসারে কিছু ঘটেছে, রেণুর তেমন কিছু হয়েছে শুনলে মা সারারাত ঘুমোতে পারবে না। ঠিক আমার মতই বাবার চোখে জল আসবে।"[৫২]

উপন্যাসের মূল ঘটনা রেণুর ইনস্যানিটি। গোটা উপন্যাসে সে অর্থে ঘটনা আর কিছু নেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পরিবারের প্রতিটি মানুষের নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং কথক অনিমেষের আত্ম-আবিষ্কার। অনিমেষের মনে ভাবনার নানান স্রোতে উপন্যাস এগিয়ে চলে। রেণুর এমন অস্বাভাবিক অবস্থার বিষয় অনিমেষ ওরফে অনুদাকে প্রতিনিয়ত খোঁচা দেয়, ভাবায়। তার মনে পড়ে কোনো একদিন বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার পথে সেই ছোটো মেয়েটির অস্বাভাবিকতার কথা। আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে। ভারী মিষ্টি চেহারা। শান্ত, নিস্পৃহ গলায় অবিরাম ডেকে চলে — 'দইওয়ালা, ও দইওয়ালা, আমাকে একটু দই দেবে?' সেদিনের এই মেয়েটির এমন আচরণের কথা শুনে বন্ধু পূর্ণ বলেছিল —

"ঐ দুঃখটা আসলে ক্লাস কনসাসনেশ। মেয়েটিকে দেখে যেহেতু তুই বুঝতে পেরেছিস যে সে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, দুঃখ সে জন্যেই। আমাদের ঐ বস্তির রামপিয়ারীকে দেখলে তোর একটুও দুঃখ হত না।"[৫৩]

রেণুও তো তার পরিবারের একজন কিন্তু তাকে কেন তার পরিবারের লোকেরা ধীরে ধীরে বাইরের লোক করে তুলছে। শুরুর দিকটায় পরিবারের প্রত্যেকেই যেন তার অস্বাভাবিকতাকে চিহ্নিত

করতে চাইছে। আর এটা যখন সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, রেণুর সত্যি সত্যি ইনস্যানিটি তখন প্রত্যেকেই যেন তাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারটুকুও ভালোমত করে না। তাকে বোঝার চেষ্টাও করে না। উল্টে তাকে বুঝিয়ে দেয়। তার চলাফেরায় পোশাকে-আসাকে এবং কখনো কখনো কথাবার্তায় দিনদিন সে স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলছে। বাড়িতে কোনো আত্মীয় এলে তাদের কাছ থেকে আড়াল করা, প্রতিবেশিদের কাছ থেকে আড়াল করা এবং পিসেমশাইয়ের ক্লাইন্টদের কাছ থেকে আড়াল করা এই তো নিত্যদিনের কর্ম হয়ে উঠল পিসেমশাই ও পিসিমার। পূর্ণ আবার যেন অনিমেষের মধ্যে জেগে ওঠে বলে —

> ''আমরা মধ্যবিত্তরা মাইরি অদ্ভুত মানুষ। আমাদের যখন কান্না পাওয়ার কথা তখন আমরা লজ্জা পাই। দুঃখ কষ্টই অনুভব করার মত অবসরও আমাদের নেই। সংসারে অভাব থাকলে, ছেলে খারাপ হয়ে গেলে, মেয়েকে তার স্বামী না নিলে, স্ত্রী ছেড়ে চলে গেলে, মদ্যপ স্বামী রাত কাটিয়ে ফিরলে কেঁদে হালকা হবারও উপায় নেই। শুধু লুকিয়ে রাখ, লুকিয়ে রাখ।''[৫৪]

অনিমেষের কেবলই মনে হতে থাকে পরিবারের প্রত্যেকেই রেণুর প্রতি অবিচার করছে। তাকে কেউই বুঝতে পারছে না। আর বুঝতে চাইছেও না। প্রথমটায় তার রাগ হল অরুণের উপর — ''একটা ব্যাপার প্রথম থেকেই আমার চোখে পড়ছিল। খেলার ফাঁকে, হাসি ঠাট্টার ফাঁকে, অরুণদা এক-একবার আড়চোখে রেণুদিকে দেখছিলেন, খুঁটিয়ে দেখার মত করে। যেন কিছু খুঁজে বের করতে চাইছেন। আমার খারাপ লাগছিল। কারো মধ্যে ইনস্যানিটি দেখা দিলে তা কি খুঁজে বের করতে হয় নাকি! সে তো যে-কেউ বুঝতে পারবে। এমন একটা সন্দেহের শিকার হলে মানুষ তো আপনা থেকেই পাগল হয়ে যাবে। আমার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল রোগটা রেণুর নয়, অরুণদার। আমার সেজন্যে ভেতরে ভেতরে ভীষণ রাগ হচ্ছিল অরুণদার ওপর।''[৫৫] এ ঘটনার আরও কিছুদিন পর অনিমেষের পিসেমশাই কোর্ট থেকে ফিরে শুয়ে আছেন। অনিমেষকে এনাসিন আনার জন্য ডাকছিলেন। হঠাৎ সেখানে রেণু এসে হাজির। ও তখন একেবারে স্বাভাবিক। পরম

মমতায় রেণু তার বাবার মাথা টিপে দিতে চাইলে — ‘‘পিসেমশাই সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সরিয়ে দিলেন। — না না, দিতে হবে না। রেণুর সারামুখ কেমন অপ্রতিভ দেখাল। যেন বুকের মধ্যে গুমড়ে ওঠা ব্যথাটা অনেক কষ্টে ও সহ্য করছে। সারামুখ কালো হয়ে গেল ওর। পিসেমশাই নিজের মনেই যেন বললেন, যা নোংরা হয়ে থাকিস, দুর্গন্ধে কাছে টেকা দায়। রেণু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।’’[৫৬] বাড়ির বড়োদের পাশাপাশি টুনটুন ও বাবুলের আচরণও রেণুর প্রতি সহজ থাকে না —

> ‘‘রেণু টুনটুনের ঘাড়ে হাত রেখে ওকে আদরে জড়িয়ে ধরল। টুনটুন অস্বস্তি বোধ করল। ও রেণুর কাছে আসতে চায় না। রেণু বুঝতেও পারল না, ও খুব আদর করে বললে আমার বেনারসীখানা দেব, পড়বি তুই। কি সুন্দর যে তোকে লাগবে! বেনারসী পড়তে পাবে শুনে টুনটুনের মুখ উজ্জ্বল হল। সত্যি দিবি তুই? এনেছিস? রেণু ছেলেমানুষের মত ওকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বললে, দেবো, দেবো। এনেছি। আমি নিজের হাতে তোকে সাজিয়ে দেবো আজ, খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেবো আজ, খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেবো দেখিস . . . সঙ্গে সঙ্গে টুনটুন ওকে দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল। মাগো, তুই দিবি সাজিয়ে তার চেয়ে আমার বেনারসী চাই না। তুই যা নিজে সেজে থাকিস, দেখলেও ঘেন্না।’’[৫৭]

ময়লা কাপড় পরে থাকে রেণু। সাজগোজে কোনো খেয়াল নেই। হাতে বড়ো বড়ো নখ। তাই রেণুর হাতে খেতেও চায় না বাবুল। ভাতের থালা মুখের কাছে নিয়ে গেল ঠেলে ফেলে দেয় বাবুল। রেণু যে সবাইকে ভালোবাসতে চাইছে। বাড়ির সবার প্রতি ওর ভীষণ মায়া। কিন্তু কেউ ওর ভালোবাসা নিতে পারছে না। রেণুর প্রতি পরিবারের লোকেদের এমন আচরণ অনিমেষকে বিষণ্ণ করে তোলে। রেণুর প্রতি তাদের এই অবহেলাকে সে মেনে নিতে পারে না।

আবার কাউকে দোষারোপও করতে পারে না —

> ‘‘কারণ পিসেমশাই, বাণীপিসিমা, টুনটুন, বাবুল, অরুণদা হয়তো আমিও সেই অদ্ভুত সমাজের মানুষ, যে সমাজে সবাই শুধু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। একটি অপ্রকৃতিস্থ মানুষ আছে, বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে, এই লজ্জায় তাই সব মানুষগুলো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছে . . . আমি জানি, আমরা সবাই জানি, একমুঠো সরষে ভিক্ষে দেবার মত মৃত্যুহীন কোন বাড়ি নেই। গোপন দুঃখ কিংবা গোপন লজ্জা প্রতিটি মুখের আড়ালে। অথচ একটু ভাবলেই মনে হয়, কত তুচ্ছ সেইসব লুকোনো দুঃখ কিংবা লজ্জা। একটা জামার বোতাম কিংবা চুলের কাটার মতো, পিসেমশাইয়ের জুতোর ফিতে কিংবা বাবুলের প্যান্টের বেল্টের মতই তুচ্ছ। আর সে-সব লুকোতে লুকোতে মানুষগুলো পাগল হয়ে যায়। পাগলের মত ব্যবহার করে। অথচ আমি তো ওদের দোষ দিতে পারি না। আমরা তো শুধু লুকোতেই শিখেছি। আর এমনিভাবে আমরা অপ্রকৃতিস্থ মানুষের একটা সমাজ গড়ে তুলেছি। সে সমাজে চরম দুঃখ শেষ অবধি গোপন লজ্জা হয়ে যায়।’’[৫৮]

পরিবারের সবাইকে নিয়ে সমালোচনা করতে করতে অনিমেষ এবার নিজের দিকে চোখ ফেরায়। পুরোনো ঘটনার সূত্র ধরে রেণুর মানসিক বিপর্যয়ের কারণ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল। স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে তার চোখে যেন ক্রমশ মধুর স্মৃতি ভেসে উঠল। এই বাড়িতে তাকে সহজ করে তুলতে রেণুই প্রথম এগিয়ে এসেছিল। এরপর অনর্গল আড্ডা। সকলের ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া কত মধুর স্মৃতি—

(ক) ‘‘কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরছি, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে তখন। বাস

থেকে নেমে বাড়ি আসতে অনেকখানি তো হাঁটতে হয়। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আরো একটু বাড়লো। আমরা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম। রাস্তার দুপাশে বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে ভিড় করে লোক দাঁড়িয়ে পড়ছিল দোকানের দরজায়, বাড়ির বারান্দার নীচে। চুল ভিজে যাবে বলেই হয়তো রেণু হাটতে হাটতে শাড়ির আঁচলটা মাথার ওপর ঘোমটার মত টেনে দিলো . . . ওর ঘোমটা টানা মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ঠাট্টা করে বললাম, লোকগুলো সব তোকে বোধহয় বউ ভাবছে। সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠলো, আহারে, তোমাকে তো একদম বাচ্চা ছেলে ভাবছে, তোমার আবার বউ ! নিজেকে ভীষণ অপ্রতিভ লাগলো।"[৫৯]

(খ) ''সত্যি করে বলো না মনুদা তুমি কাউকে ভালোবাস না ?"[৬০]

(গ) ''তুমি বলো না মা কে, রেণু এখন বিয়ে করবে না।"[৬১]

তারপর বিয়ের দিন রেণুর কান্নাভরা মুখ দেখে অনিমেষের মনে হল — ''এ বিয়ের সঙ্গে ওর যেন কোন প্রাণের যোগ নেই। শুভদৃষ্টির সময় ও কিছুতেই চোখ তুললো না। যেন দুটো পাথরের হাতে ওরা মালা ধরিয়ে দিয়েছে। দুটো হাত তখন ওর প্রাণহীন। মালাটা পরাতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল। তাড়াতাড়ি কে মালার সুতোটা আবার বেঁধে দিল।"[৬২] এরপর অনিমেষ আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। কেউ যাতে না দেখে তাই সে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিল। রেণুর প্রতি শুধু মায়া থেকেই যদি চোখে জল এসে থাকে, তাহলে তাকে লুকোনো কেন ? আসলে এতোদিন ধরে সে নিজেকে রেণুর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। নিজের ভালোবাসাকে সে প্রকাশ করতে পারেনি। আর রেণুর এই ইনস্যানিটির প্রধান কারণ যে সেই সুপ্ত ভালোবাসা তা আবিষ্কার হল। চোখে আধোঘুমে তাই কে যেন বলে যায় — ''রেণুর জন্যে তোমার এতো মায়া ? পিসেমশাই তাকে কাছে এসে মাথা টিপে দিতে দেননি, সেজন্য তাকে তোমার খুব নির্দয় মনে হয়েছিল ? . . . বাণীপিসিমা ওকে সত্যনারায়ণের সিন্নি মেখে দিতে দেননি, তাই তুমি কষ্ট পেয়েছিলে। টুনটুন ওর বেনারসী শাড়িখানাই নিতে চায়নি, ও উদ্ভট কিছু সাজিয়ে দেবে এই ভয়ে। মুখের ওপর বলেছিল, তুই যা সেজে থাকিস ! সকলেই নির্দয়, তোমারই যত করুণা ! কিন্তু তুমিই তো আসল কালপ্রিট।"[৬৩] এই ভয়ঙ্কর সত্য আবিষ্কারের পরেও অনিমেষ কারো কাছে প্রকাশ

করতে পারে না রেণুর ইনস্যানিটির উৎস কোথায়। প্রকাশ করতে পারে না তারই কারণে রেণুর আজ এই অবস্থা। শুধুই আত্মকথনে বলে যায়,—

> ''রেণু, এখন যে আমি সব জানি, সব জানি। তোর প্রতিটি কথা, এখন আমার কাছে স্পষ্ট। তোর বইয়ের মধ্যে পাওয়া সেই অসমাপ্ত চিঠি কাকে দিতে চেয়েছিলি আমি জানি। তোর মধ্যে একটা চাপা দুঃখ ছিল, কোনদিন তুই প্রকাশ করতে পারিস নি। আমার মতই। ওরা সেই ক্ষত কোথায় আছে খুঁজে বের করতে চাইছেন। পিসেমশাই, অরুণদা, ডাক্তার বোস সকলেই। কিন্তু কেউ কোনদিন সেটা খুঁজে পাবে না। কারণ, আমি তো কাউকেই সে-কথা বলতে পারব না। বলতে পারব না, আমিই সেই কালপ্রিট।''[৬৪]

ভালোবাসার উপলব্ধি অন্যদের মতো অনিমেষকেও ভয় পাইয়ে দেয়। পাছে তার এই গোপন রহস্য রেণু যদি পরিবারের অন্যান্য লোককে কিংবা ডাক্তার বোসকে ভুল করেও বলে ফেলে তাহলে আর লজ্জার শেষ থাকবে না। আর এর ফল অনিমেষের ক্ষেত্রে আরো মর্মান্তিক ও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। যে-কারণে রেণুকে পাগলাগারদে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল অনিমেষ। নিজেকে অবাঞ্ছিত লজ্জা আর ভয় থেকে বাঁচানোর তাগিদে পাগলাগারদে রেণুকে ঠেলে দিয়েছে তার গোপন ভালোবাসার মনুদা। ফলে উপন্যাসের শেষে কথক অনিমেষের আত্ম-আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমরা যে সত্যে উপনীত হই, সেখানে রেণুর পরিবারের পাশাপাশি অনিমেষও আর পাঁচজন আত্মসচেতন, নিরাপত্তাবিলাসী মধ্যবিত্তই হয়ে যায়। যাদের কাছে নিজের সামাজিক অবস্থানের মূল্য অনেক বেশি। রমাপদ চৌধুরীর 'লজ্জা' এই মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনেরই গতিশীল আখ্যান।

।।পাঁচ।।

'হৃদয়' উপন্যাসটি শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৮৩ (১৯৭৬) প্রকাশিত হয়। তার কিছুদিন পরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গপত্রে রমাপদ লিখেছিলেন 'এখনো যাদের হৃদয় আছে'।

উপন্যাসটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে নীহাররঞ্জন রায় ঔপন্যাসিককে চিঠি লিখে জানিয়েছেন – ''আপনার 'হৃদয়' বইখানা যথাসময়েই আমার হাতে পৌঁছেছিলো, এবং আমিও যথারীতি প্রথম অবসরেই বইখানা পড়ে ফেলেছিলাম— একটানা, একাসনে বসে। বোধহয়, প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে। তা' সম্ভব হয়েছিলো শুধু বইটির গুণে। আপনার বিষয়াশ্রয়, বিন্যাসের পারিপাট্য, নির্মাণদক্ষতা, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীল গতি এবং জীবনের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, সব কিছুকে আপনি একসঙ্গে বুনেছেন অপরিসীম নিপুণতায়। আপনার অনেক রচনাই আমি পড়েছি; বস্তুত, আমি আপনার অনেক অনুরক্ত পাঠকের অন্যতম। কিন্তু আপনার এই বইটির মতো এমন স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ ও প্রাণময় গল্প-উপন্যাস আমি বহুকাল পড়িনি, এমনকি আপনার নিজের রচনা-সংগ্রহেও নয়।''[৬৫]

আলোচ্য উপন্যাসটি এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃদ্ধ পিতার হার্ট অ্যাটাককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্ত্রী, তিন ছেলে, মেয়ে বউদের নিয়ে সংসার। হৃদযন্ত্রের সাময়িক বিকল হওয়ার ঘটনা উপন্যাসে তেমন কোন উদ্বেগের সৃষ্টি না করলেও এই 'হৃদয়' শব্দটি হয়ে উঠেছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। 'হৃদয়' বলতে বোঝায় মানবদেহের হৃদপিণ্ডকে। অন্যদিকে এই হৃদয় কথাটির মধ্য দিয়েই উঠে এসেছে মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন – বাবা-মা-র সঙ্গে সন্তানের, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকার। বৃদ্ধ পিতার হঠাৎ অসুস্থতা পরিবারের সদস্যদের কিছুটা বিচলিত করলেও কোনো বড় ধরনের সংকটের সৃষ্টি হয়নি। 'খারিজ' উপন্যাসে পালানের মৃত্যুতে জয়দীপের সংকট, 'লজ্জা'-য় অপ্রকৃতিস্থ রেণুকে নিয়ে পরিবারের যে সংকট তারচেয়ে 'হৃদয়' উপন্যাসে পিতার হার্ট অ্যাটাকে পরিবারের সমস্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। হার্ট অ্যাটাকের ফলস্বরূপ পেসমেকারের টাকা যোগাড় করা নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিলেই সবই হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আসলে এই কাহিনিবৃত্তের মধ্য দিয়েই কথাকার রমাপদ চৌধুরী সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শ্রীহীন রূপটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

কথাকার আলোচ্য উপন্যাসের কথক নির্বাচন করেছেন শুভেন্দুকে অর্থাৎ নামহীন বৃদ্ধ পিতার বড় ছেলেকে। পড়াশুনায় তিনভাইয়ের মধ্যে সে সবচেয়ে উজ্জ্বল হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৃত্তে সে সবচাইতে পিছিয়ে। টিউশনি যার একমাত্র ভরসা। দীর্ঘদিন বেকার থাকার

পর একটা চাকরি জুটে। কিন্তু এর মাইনে এতোটাই কম যে কাউকে বলা যায় না এই হীনমন্যতাই তাকে অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এমন কী নিজের দীর্ঘদিনের একান্ত ভালোবাসার জগতকেও দূরে সরিয়ে রেখেছিল সে। তাই ইনু নিজের চাকরিকে কেন্দ্র করে সংসার বাঁধার কথা বললেও শুভেন্দু সম্মত হয়নি —

> ''. . . আমি ওকে স্পষ্ট করে বলতে পারতাম না। কারণ ও নিজেই যে স্পষ্ট করে বলেছিল, দুজনের সংসারে ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো। অর্থাৎ ও ভেবে নিয়েছিল বিয়ের পর আমরা দু'জনে কোথাও গিয়ে সংসার পাতবো। অথচ আমি জানতাম, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বাবা-মা'র সংসার ছেড়ে আমি কোনদিনই চলে যেতে পারব না। আমি বড় জোর বিয়ে করে ইনুকে এ-বাড়িতেই নিয়ে আসতে পারি। ছোটখাটো যৎসামান্য একটা চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতেই আমি মনে মনে সে-কথা ভেবেছিলাম।''[৬৬]

আর তাই মেজো ভাই সুখেন্দুর বিয়েতে সম্মতি দেওয়ার পাশাপাশি জানায় যে সে আর কোনদিন বিয়ে করবে না। কোথাও একটা রাগ বা অভিমান যেন কাজ করছিল – চাকরি না পাওয়া, হয়তো নিজের বাবার ওপরেই। এই শুভেন্দুই বাবা অসুস্থ হওয়ার পর বাবাকে অন্যভাবে নতুন করে চিনতে শেখে – ''মানুষটাকে আমরা গোঁড়া নীতিবাগীশ প্রাচীনপন্থী ভেবেছিলাম। আদর্শবাদী। কিন্তু মানুষটা স্বপ্ন দেখতো, সুখী নিখুঁত সম্পূর্ণ একটি সংসারের। কারণ তারমধ্যে একটা প্রকাণ্ড ভালোবাসা ছিল।''[৬৭] পিতার গম্ভীর মুখের অন্তরালে স্নেহসিক্ত হৃদয়টি সকলের অজ্ঞাতেই থেকে যায়। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ছেলেদের সুখের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে দিতে কখন যেন নিজের জীবনকে ইজিচেয়ারে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন। সংসারের এক সময়ের সর্বময় কর্তা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর কেউই তার দিকে তাকানোর অবসর পায় না, হঠাৎ এই অকর্মণ্য অবসরপ্রাপ্ত লোকটির হার্ট অ্যাটাকই সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়, অথচ এই লোকটিই গোটা পরিবারকে বটগাছের মত গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তাই কথকের মনে পড়ে যায় –

> ‘‘বাবা একদিন ঠাট্টা করে কাকে যেন বলেছিল, বোটানিকসের বটগাছের মত সংসারটা গড়ে তুলতে চাই। গুঁড়িটা না থাকলেও ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে গাছটা থাকবে মাথা তুলে। বিশাল, ছায়াঘন শান্ত পরিচ্ছন্ন।’’[৬৮]

অথচ তার চোখের সামনেই সংসারে ভাঙন দেখা দেয়। একই ছাদের নীচে বসবাস করার পরও ছেলেরা ক্রমে ক্রমে একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মেজো ছেলে সুখেন্দুর বিবাহ বিচ্ছেদের পর্যায়ে, ছোট ছেলে নবেন্দু মেয়েকে আলাদাভাবে মানুষ করার জন্য অফিসের দূরত্বের দোহাই দিয়ে অন্যত্র বসবাস করার কথা ভাবছে, এসমস্ত কিছুর পাশাপাশি নিজেকেও বাবার এই পরিণতির জন্য দায়ী করে শুভেন্দু। শুভেন্দু ভাবে সংসারকে সুন্দর করে তুলতে হলে টাকার প্রয়োজন; তাই মনে হয় বাবার জীবনের প্রথম আঘাত সে নিজেই। স্বচ্ছলতাই যদি সংসার জীবনকে সঠিক করে তুলতে পারত তাহলে সুখেন্দুর এই পরিণতি কেন? তাই কথকের মনে হয়,

> ‘‘আমরা সকলের সঙ্গে সকলে এমনভাবেই জড়িয়ে আছি, কেউ একা সুখী হতে পারি না। এরই নাম সমাজ কি না কে জানে। সমাজ এমন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে আমাদের সকলকে ফেলে দিয়েছে, সেখানে আমরা নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে ঘুরছি, সুখী হবার পথ খুঁজছি। কিন্তু যতই নিজেকে একা মনে করি না কেন, সকলের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি এমনভাবেই যে পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই।’’[৬৯]

আর তাই শুভেন্দু নীরব আত্মকথনে নিরন্তর অন্বেষণ করে চলে পিতার হৃদযন্ত্রের বিকল হওয়ার কারণ। তার পিতা চিরকালই ফল ফুলে সমৃদ্ধ একটি বৃক্ষ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ‘‘তার বদলে আঘাতে আঘাতে মানুষটা নিজেই ক্ষয়ে গেল।’’[৭০] তাই তার এই রোগ সারানো সম্ভব নয়। পেসমেকার বসিয়ে হৃদযন্ত্রকে সঞ্চালিত করা যায় কিন্তু সম্পর্কের ভাঙন সারিয়ে তোলার বা জোড়া লাগানো কখনই সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য চরিত্র তথা কথক শুভেন্দুই একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে মা-বাবার ভালো সম্পর্ক, সেই শুভেন্দুই এই ভালো সম্পর্ককে নিয়ে সন্দিহান — ''এক এক সময় মনে হত আমি বিয়ে করিনি বলেই বাবা-মা ধরে নিয়েছে আমি নিঃস্বার্থ। ওরা বিয়ে করে একই ছাদের নীচে আছে বটে, কিন্তু বাবা মা বেশ বুঝতে পারে ওরা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি যেদিন ইনুকে বিয়ে করবো, বিয়ে তো করবোই, তখন কি বাবা আবার নতুন করে আঘাত পাবে। আমি তো সেজন্যেই একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছি।''[৭১] তার এই দ্বিধা থেকেই প্রশ্ন জাগে মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এই সমস্তই কী আর্থিক স্বচ্ছলতার দরুণ, এর মধ্যে কী কোন আত্মিক যোগ নেই। এই জিজ্ঞাসা আরো তীব্রতর হয় যখন সে বলে —

> ''মায়া মমতা, স্নেহ ভালোবাসা ওদের কাছে একটা অঙ্কের হিসেব শুধু। কারণ ওরা যে জীবনে সাকসেসফুল। আমার মত অপদার্থ মানুষগুলো কিছুই দিতে পারে না বলে শুধু ভালোবাসা দিতে চায়।''[৭২]

তার এই অহঙ্কারবোধ সে কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ করতে চায় না। নিজেকে চিরে চিরে দেখতে গিয়ে অবাক হয়। ইনুকে ভালোবেসে বিয়ে করার মধ্যে তো অসঙ্গতি ছিল, পরিবারের কাছে বিশেষত বাবা-মা'র কাছে আসলে সে নিজের ভালোবাসার অহংকারবোধের ইমেজটুকু হারানোর ভয়ে ভীত ছিল — ''দিনে দিনে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে আমি কি নিজের একটা মুখোশ গড়ে তুলেছি! আর সেই মুখোশটার জন্যে সকলের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়োতে কুড়োতে আমি কি একটা গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছি! তাই মুখোশটা খুলে ফেলতে আমার এত ভয়।''[৭৩] সেজন্যই বাবার অসুস্থতা তাকে বিব্রত করে তোলে। অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও বাবার পেসমেকার যোগাড় করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এতোদিনকার দ্বিধা, সংকোচ কাটিয়ে প্রেমিকার কাছেই শেষপর্যন্ত তাকে হাত পাততে হয়। আর —

> ''ইনুও দেরী করেনি এক মুহূর্ত, বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে বের করে দিতে।''[৭৪]

তাই শেষপর্যন্ত ইনুকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়াও তার কাছে সহজ হয়ে পড়ে। তার এই হৃদয়হীনতার পরিসীমানায় ভালোবাসার মোড়কে কৃতজ্ঞতার বীজ বপন করে। তাই উপন্যাস কথক শুভেন্দু ইনুকে নিয়ে যেতে চায় সেই বারান্দার দিকে যেখানে, ''ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে একটি প্রাচীন স্বপ্ন, আশা, আদর্শ। একটি অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা, যে সকলকে সুখী দেখতে চায় বলেই অনন্ত দুঃখে দুঃখী। তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক আওয়াজটা আমরা শুনতে পাবো, চতুর্দিকে এখনো সকলেই যে শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। শুধু জানে না, ওটার আয়ু শেষ হয়ে আসছে, কারণ শব্দটা পেস-মেকার যন্ত্রের, যেটা ঐ হৃৎপিণ্ডটাকে এখনো চালু রেখেছে।''[৭৫]

উপন্যাসের কাহিনি বয়ানে কথাকার রমাপদ চৌধুরী একের পর এক যে চরিত্রগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'হৃদয়' উপন্যাসটি আসলে হৃদয়হীনতার আখ্যান হয়ে উঠেছে। যেখানে স্নেহ ভালোবাসা শুধুই একটা প্রয়োজনের নিরিখে গড়ে ওঠেছে সেই সঙ্গে উপন্যাসকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।

।।ছয়।।

'বাহিরি' উপন্যাসটি শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৮২ (১৩৮৯) খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ (১৩৯০) খ্রিস্টাব্দে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন 'মহুয়া ও মঞ্জরী'-কে। 'বাহিরি'-র উৎস হিসেবে লেখক উল্লেখ করেন —

> '' 'বাহিরি' আমার প্রিয় উপন্যাস। কাহিনীর 'বংশী' আমার কিছুটা পরিচিত চরিত্র, কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও বলা চলে। অবশ্যই অভিজ্ঞতার বীজাংশের ওপর সম্ভাবনার রং চড়াতে কার্পণ্য করিনি। এবং সে কাজে কিছুটা সহায়তা পেয়েছিলাম সাহিত্যিত্রিভুজ এক বন্ধুর অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু এ গল্প শুধুমাত্র একজন বংশীর গল্প নয়, বৃহত্তর এই ভারতবর্ষ নামক দেশটিরও গল্প, যে-দেশের একটি বিশাল জনসমাজ আমাদের কাছে

প্রকৃতপক্ষে বাহিরি। যাদের জন্য আমাদের সমবেদনা আছে, যাদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এবং সদিচ্ছার অভাব নেই আমাদের মনে, কিন্তু তারা সমকক্ষ হয়ে উঠতে চাইলে বা আমাদের ছাড়িয়ে যেতে চাইলেই আমাদের চরিত্র বদলে যায়, সংকীর্ণতা এসে আমাদের গ্রাস করে। এ কাহিনী একজন বাহিরির গল্প নয়, ভারতবর্ষের অগণিত বাহিরিদের গল্প। কিংবা বলা উচিত এ উপন্যাস আদৌ বাহিরিদের গল্প নয়, প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই গল্প।"[৭৬]

নাম না জানা এক ভিখিরির বংশীধর অধিকারী থেকে ক্রমশ মিস্টার বি. ডি. অধিকারী পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ঘটনাক্রমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে কাহিনির আখ্যানভাগ। পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ ছেলে সুধাময়ের পরিবারে আশ্রিত হয়ে ক্রমান্বয়ে লেখাপড়া শিখে বড়ো হওয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসে গোটা মধ্যবিত্ত সমাজের নানান দিক। যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে চলে তাকে দয়াময়ী আবিষ্কার করেন এভাবে — "যেখানে ঠাকুর দেবতা সেখানেই তো ভিখিরি। পুজো দিয়ে সাক্ষীগোপালকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসতেই সকলে ছেঁকে ধরল। একদিকে সুধাময়ের বিরক্তি, অন্যদিকে দয়াময়ী ছোঁয়া বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে ভিক্ষে দিচ্ছেন। ঝুমা তখনও এ বাড়ির বউ হয়ে আসেনি। সঞ্জয় কলেজে পড়ে, শুভা ফ্রক পরে। . . . ওদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে অনেকখানি এসে একটা গাছতলায় দেখেন একটা ভিখিরি বসে আছে। নুলো। দুটো হাতই নেই। গায়ে ঘা। একটা গামছা পাতা আছে তার সামনে, তার ওপর কিছু পয়সা ছড়ানো। আর ভিখিরিটা কাকে যেন চিৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে। . . . বাসের কাছে এসে উঠতে যাবেন, আবার একটা ভিখিরি। . . . বেশ কলাপাতা কলাপাতা কচি মুখ। সরল আর দুঃখী। গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন জামা। ভয় জড়ানো দুটি চোখ।"[৭৭] এ হেন ভিখিরি বালককে দেখে দয়াময়ীর হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার ভাষিক পরিচিতি, সে বাঙালি। আর এও স্পষ্ট হয় যে পিতৃমাতৃহীন এই বালক নুলো ভিখিরির হাতুয়া হিসেবে পরিচিত। বাঙালি হওয়ার জন্য অন্যান্য ভিখিরিরা তাকে মন্দিরের সামনে ভিক্ষে করতে দেয় না। তার এই করুণ

কাহিনি শুনে সুধাময় ও পরিবারের অন্যান্য সকলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নুলো ভিখিরির হাতুয়া ছেলেটিকে দয়াময়ী নিজের সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এখান থেকেই নুলো ভিখিরির হাতুয়ার জীবন পাল্টায়। কলকাতায় এসে গৃহভৃত্য হিসেবে সুধাময়ের পরিবারে আশ্রিত হলেও তার প্রতি দয়াময়ীর একটা স্নেহ কাজ করত। আর তাই তাকে স্কুলে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেন সুধাময়বাবু। এখানেই ঘটে আরেক ঘটনা। এতোদিন পর্যন্ত নুলো ভিখিরির হাতুয়া হিসেবে পরিচিত ছেলেটির নামকরণের জন্য সুধাময় ও তার পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়ে —

> ''বংশী, বংশীধর লিখে দিলেই চলবে? একটা পদবী চাই না? সকলে সকলের মুখের দিকে তাকাল। ছেলেটার বাবার নাম জানা নেই। একটা বানানো নাম সারাজীবন ওর পিতৃপরিচয় হয়ে থাকবে। তা হোক, কি যায় আসে তবু একটা পরিচয় তো হবে। পিতৃপরিচয়। একটা নাম শুধুই তো প্রতীক।''[৭৮]

সঞ্জয় সুধাময়ের চিন্তা দূর করে হাসতে হাসতে বলে —

> ''অধিকারী। ও তো বলেছিল সেই নুলো ভিখিরিটা ওর অধিকারী। জগন্নাথ না কি নাম, বলেছিল জগন্নাথ ওর অধিকারী। . . . সুধাময়ের মুখেও হাসি দেখা দিল। একটা বিরাট সমস্যার সুরাহা হয়েছে। . . . সুধাময় হাসতে হাসতে বললেন, বাবার নাম ওই থাক — জগন্নাথ অধিকারী, আর নাম বংশীধর অধিকারী।''[৭৯]

এভাবেই ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটে বংশীর। স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে কলেজ, এরপর চাকরি। তার এই উন্নতির গতি যত বেশি দ্রুত ততই যেন সুধাময়রা হীনমন্যতায় ভুগতে থাকেন। অথচ যাকে মানুষ করতে বা বলা ভাল সমপর্যায়ভুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য পোশাক-আসাক থেকে শুরু করে মুখের ভাষা পর্যন্ত বদলে দেওয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেছেন, অথচ সেই ফল লাভের পর কেউ তাকে আর সহ্য করতে পারে না। আসলে মধ্যবিত্ত মানসিকতা যতই আদর্শবাদিতার

পরিচায়ক হয়ে নিচুতলার মানুষকে উপরে ওঠানোর কথা ভাবে এবং কার্যত সেই কাজ করে কিন্তু সেই লোকটিই যখন সমকক্ষ হয়ে উঠতে চায় তখন তার জন্য এতটুকু জায়গা ছেড়ে দিতে নারাজ। সুধাময়দের ক্ষেত্রে কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বংশীকে বাড়িতে সুধাময়বাবু পড়াতেন। অফিস থেকে ফিরেও এতটুকু আলসেমি না করে অপরিসীম ধৈর্য সহকারে বংশীকে পড়াতেন। তাই সঞ্জয়েরও মনে হয়েছে ''বাবা যদি আমাকে এভাবে পড়াত, নির্ঘাত লেটার পেতাম।''[৮০] যে বংশীর উন্নতি সঞ্জয়ের ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে সেই বংশী সম্পর্কে একসময় সঞ্জয় গর্ববোধ করত যে ভিখিরির হাত থেকে একটা ছেলেকে নিয়ে এসে তাকে চাকর বানিয়ে দেয়নি।

উপন্যাসের বংশী চরিত্রটি যেন আগাগোড়াই বাহিরি। সে কখনো সেই গণ্ডি অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। জন্মের পর পেটের দায়ে তার মা তাকে বেঁচে দেয় নুলো ভিখিরি জগন্নাথের কাছে। সেখানকার ভিখিরির দল বংশী অর্থাৎ নুলোর হাতুয়াকে সাক্ষীগোপাল মন্দিরের সামনে তাকে ভিক্ষে করতে দেয় না, কারণ সে বাঙালি। এখানে তার ভাষিক পরিচিতি তাকে বাহিরি করে তোলে। অন্যদিকে সুধাময়ের পরিবার তার মাথা গুঁজবার ঠিকানা হিসেবে নির্ধারিত হলেও সেখানেও তার অতীতটাকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলে আর তাই শুভা চোখ পাকিয়ে বলে — ''আমাদের কথা বলবি বুঝলি? 'পারা' 'নিকি' ওসব চলবে না।''[৮১] বংশী বলে ওঠে — ''হায় কপাল, ইখানেও আমি বাহিরি হলাম . . .।''[৮২] সঞ্জয় চমকে যায় বংশীর কথায়। বাহিরি মানে তো যে বাইরে থেকে এসেছে বা বিদেশি। কোথাও যেন ঠাঁই নেই তাদের। তাই সাক্ষীগোপালের ভিক্ষুকের দল যেমন তাকে মন্দিরের সামনে ভিক্ষা করতে দেয় না, তেমনি সঞ্জয়-রাও তাকে তার ভাষা বলতে দেবে না। বংশী সুধাময়ের পরিবারে স্থান পায় ঠিকই কিন্তু কোনোদিন বাড়ির লোক হয়ে উঠতে পারেনি। সেখানেও তার পরিচিতি আশ্রিত হিসেবেই। আর সেজন্যই বংশীর জন্য নতুন জামাকাপড় কেনা হলেও কেনা হয় সস্তা ছিটের জামা। এমন কী বাড়ির ভৃত্য মধুসূদনও বংশীকে তার আসল পরিচয় বার বার জানান দেয় — ''ব্যাটা নুলো ভিখিরির হাতুয়া মাছ খাবে।''[৮৩] আবার দয়াময়ীর ছোটো বোন বিনু বেড়াতে এসে তাকে বাড়ির চাকর মনে করে দয়াময়ীর কাছে বংশীর আবদার করে মিনুকে স্কুলে পৌঁছানোর জন্য। সুধাময়ের ভাইও বেড়াতে

এসে বংশীর পড়াশুনার পেছনে সুধাময়ের খাটনিকে পণ্ডশ্রম বলেই উল্লেখ করেছেন —

> "... কেন পণ্ডশ্রম করছ ওর পিছনে, দেখবে দুদিন বাদেই ভেগে যাবে। বংশী শুনল, লজ্জায় কিংবা লাঞ্ছনায় মাথাটা নুয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে বললে, না বাবু আমি কুথাও যাব না।"[৮৪]

বংশী কোথাও যায় না। ক্রমশ স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি চলে, ফর্ম আসে, স্কুলের ভর্তির খাতায় নাম লেখা হয় বংশীধর অধিকারী। তাকে থেমে থাকতে হয় না। আর তাই তার জায়গা হয় দোতলার বারান্দায়। বড়ো হয়ে ওঠার সোপানের এক এক ধাপ পেরিয়ে সে বংশীধর অধিকারী থেকে মিস্টার বি. ডি. অধিকারী পর্যায়ে উন্নীত হয়।

উপন্যাসে সুধাময় চরিত্রের মধ্যে মধ্যবিত্তের এক স্ববিরোধী মনোভাবেরও পরিচয় মেলে। দয়াময়ীর বোন বিনু যখন মনে করে যে সুধাময়রা বিনা মাইনের এক চাকর পেয়েছেন এতে একদিকে যেমন নিজেকে অপমানিত বোধ করেছেন অন্যদিকে বিশ্বায়ন নির্ভর বাজার অর্থনীতির কূটাভাসকেই তুলে ধরেছেন নিজস্ব বয়ানে —

> "... নীচ স্বভাবটাই বোধহয় মানুষের কাছে স্বাভাবিক। স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না বলেই সবজায়গায় স্বার্থ দেখে ... আসলে ওদের তো দোষ নয়। স্বার্থ ছাড়া এক পাও যারা এগোয় না, তারা কি করে ভাববে কেউ নিঃস্বার্থ হতে পারে। ... মানুষ তো কখনও কখনও পরের উপকারও করে।"[৮৫]

এরকম মনোভাবাপন্ন সুধাময়েরও একসময় মনে হয় বংশীকে তিনি তো মানুষ করতে চেয়েছিলেন, সমকক্ষ করে তুলতে চাননি। তাই বংশীর পাসের খবর তাকে আনন্দ দেয় না বরং তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন, কেননা বাপ্পা পড়াশুনায় অমনোযোগী, শেষ পর্যন্ত না তাকে খেটে খেতে হয় — এই গ্লানি তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। অথচ তার বার বার মনে হয়েছে বংশীকে নুলো ভিখিরির কাছ থেকে এনে মানুষ করে ভালোই করেছেন। উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ বিভিন্নভাবে উঠে এলেও এই একটি জায়গায় যেন সবাই একসূত্রে গাঁথা। দয়াময়ী ব্যতীত কী সুধাময়, কী শুভা, কী সঞ্জয়

প্রত্যেকেই বংশীকে ভালোবাসলেও শ্রমিক মালিকের মতো একটা দূরত্ব যেন সর্বদাই বজায় রেখে চলে। আর তাই সঞ্জয় বলে ওঠে — ''ও একটা কেরানি হতে পারলেই আমরা ধন্য।''[৮৬] কেননা বংশী তো একটা ভিখিরির চাকর ছিল, দেখে মায়া হয়েছিল দয়াময়ীর তাই তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। বাড়ির চাকর হলেও সে বেঁচে যেত, কারণ বাড়ির চাকরদেরও একটা স্ট্যাটাস থাকে কোন বাড়ির চাকর, কার চাকর। চাকরির বেলাতেও সেই একই ব্যাপার — সেন্ট্রাল না স্টেট। কিংবা কোন নামী দামি প্রতিষ্ঠান। তাই এক এক সময় সঞ্জয়ের মনে হয় বংশীর এই বেড়ে ওঠার পেছনে হয়তো তাদের দয়ামায়াই কাজ করেছিল না অন্যকিছু —

> ''দয়ামায়া কি তোমার গুণ? না, ছেলেটার কৃতিত্ব? কই, আর দশটা কালোকুলো ভিখিরির ছেলেকে দেখে তো তোমার দয়া হয়নি। আমরা বড়জোর তাকে কয়েকটা পয়সা ছুঁড়ে দিই। গাড়ি চাপা পড়তে পারে দেখেও একজন কানাখোঁড়া মানুষের হাত ধরে সরিয়ে আনি না। আসলে বংশীর সেই সরল অসহায় চাউনি, ভিজে বালির মত মোলায়েম মুখে এমন একটা মায়া জড়ানো, ওর মা ওকে বেচে দিয়ে গেছে, হাতুয়া বলে সকলে, নুলো ভিখিরির হাতুয়া এইসব শুনেই তো দয়ামায়া হয়েছিল।''[৮৭]

আসলে আমরা মধ্যবিত্তরা দয়া দেখাতে জানি, কিন্তু যথার্থ অর্থে কাছে টেনে নিতে পারি না। আমাদের মানসিকতা হল ভাল থাকুক, শিক্ষিত হয়ে উঠুক অসুবিধে নেই, শুধু ছাড়িয়ে ওপরে না উঠলেই হল। মধ্যবিত্তরা সমাজে তার অবস্থান বজায় রাখার জন্য তার একান্ত নিজস্ব বৃত্তে ছোটো বড়ো ব্যবধানটুকু অনড় রাখতে চেষ্টা করে — ''কারণ ওই দূরত্ব না থাকলে আমরা নিরাপদ থাকব না। নিরাপত্তা থাকবে না।''[৮৮] কিন্তু এই সমস্যার সমাপ্তি এখানেই শেষ হয় না, বরং আরও জটিল আকার ধারণ করে কর্মক্ষেত্রে বংশী যখন সঞ্জয়ের সিনিয়র হিসেবে যোগ দিতে আসে। একদিকে নিরাপত্তা বোধের অভাব, অন্যদিকে সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়ে দিশেহারা সঞ্জয় একবার চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ভাবলেও হীরেন সমবেদনা জানাতে এলে সঞ্জয়ের

মনে হল বংশী যেন ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করতে চেয়েছে। তাকে হারিয়ে দিতে চাইছে। নিজের চরমতম অক্ষমতার মধ্যে শুধু বংশীর অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচারণই করে, যে স্মৃতিচারণার মধ্যে বংশীর কদর্য ইতিহাসই বার বার ধ্বনিত হয়। কিন্তু এই বংশীই তার ছোড়দাকে অর্থাৎ সঞ্জয়কে চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে বাঁচায়, সঞ্জয়ের সিনিয়র হিসেবে চাকরিতে যোগ না দিয়ে। তাই সঞ্জয়ের আত্মকথনে উঠে আসে — ''. . . বংশী, আমি জানি জানি। আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি বরাবর বলেছি, তোর কোনও কৃতজ্ঞতা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই। আজ আমিই তোর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। তুই আমাকে অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচিয়েছিস; অপমান থেকে বাঁচিয়েছিস।''[৮৯] সঞ্জয়ের এই স্বীকারোক্তি আসলে এতোদিনকার পুঞ্জীভূত রাগ ও অপমানবোধেরই প্রায়শ্চিত্ত। ''রমাপদ সাধারণত এ ধরণের কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণের কাহিনি লেখেন না।''[৯০] তাই উপন্যাসের এই জায়গায় শুভা বংশীর কাজে যোগ না দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে এভাবে —

> ''আসলে ও তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আসলে ভাবেইনি,
> তুমি ওখানে আছ। . . . ওর অতীতটা যে তুমি জানো। ও যে
> একটা নুলো ভিখিরির হাতুয়া ছিল নেহাত আমাদের দয়ায় . . .
> ও তো আমাদেরও ওর মতই ভাবে। আমরা যে ভদ্রলোক, অত
> নীচ হতে পারি না, তা ও জানবে কি করে।''[৯১]

উপন্যাসের এই জায়গায় রয়েছে বিশুদ্ধ স্যাটায়ার। প্রসঙ্গকথায় রমাপদ চৌধুরী নিজেই উল্লেখ করেছেন —

> ''শ্লেষটি বোঝা যাবে সঞ্জয়ের একটি সংলাপ মনে রাখলেই।
> 'তার আগেই সঞ্জয় কেটে পড়ল। প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে বলে বসল,
> শালা অচ্ছুতের বাচ্চা। ওর হিস্ট্রি জানে কেউ? আমরা যে
> ভদ্রলোক নীচ হতে পারি না' এই সংলাপটিকে সেজন্যেই
> স্যাটায়ার বলেছি।''[৯২]

'খারিজ' উপন্যাসের উৎসর্গ পত্রে কথাকার রমাপদ চৌধুরী লিখেছিলেন — ''পালান/

তোরা যেদিন পড়তে শিখবি/ সেদিনের আশায়।”[৯৩] পালান পড়াশুনা জানত না, টুকাইয়ের সঙ্গে ছিল পড়া পড়া খেলা। যে বয়সে পালানের স্কুলে যাওয়ার কথা সেই বয়সে সে টুকাইকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যায়। পালানের পরিণতির জন্য অশিক্ষাকে দায়ী করলেও ‘বাহিরি’-র বংশী কিন্তু অশিক্ষিত নয়। সে শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, ভদ্রলোক। বেশভূষা থেকে শুরু করে মুখের ভাষা, দারুণ রেজাল্ট, ভালো মাইনের চাকুরি — এসমস্তই তার ভাগ্যে জুটে ঠিকই, কিন্তু কোথাও যেন আত্মিক বন্ধন লক্ষ করা যায় না। আগাগোড়াই যেন আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের সুর ধ্বনিত হয়। তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বংশীদের শিক্ষার কথা, উন্নতির কথা ভাবে, কখনো বা সুযোগও করে দেয়, কিন্তু তার বদলে তারা প্রতিপদে কৃতজ্ঞতার দাবি করে। তাই বংশী যখন বাবুর বদলে মেসোমশাই, দাদাবাবুর বদলে সঞ্জয়দা, ছোড়দির বদলে শুভাদি ডাকতে শুরু করে তখন সঞ্জয় সেটা মেনে নিতে পারে না —

> ‘‘ওকে আমরা সমান ভাবতাম, বাড়ির লোক করে নিয়েছিলাম, সেটা আমাদের মহানুভবতা। . . . তা বলে ও নিজেও সমান ভাববে নাকি। ব্যাটা চিরকাল বাবু বলে এসেছে, এখন বাবু বলতেও লজ্জা।”[৯৪]

আর তাই প্রতিটি পদক্ষেপে বংশীদেরকে নিজেদের গণ্ডির বাইরে রাখতে চায়। যত উপরেই উঠুক না কেন তাকে অবহেলা করার মধ্যে যেন এক অন্যরকম আত্মগরিমা অনুভূত হয়। ফলে কলিং বেলের আওয়াজ কানে এলেও কেউ গ্যেট খুলতে এগিয়ে যায় না — ‘‘. . . যতক্ষণ পারে বাজাক না, কিংবা ক্লান্ত হয়ে কেউ সাড়া দিল না দেখে ফিরে যাক।”[৯৫] আর তাই ‘বাহিরি’ উপন্যাসটি বাহিরিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও তা যেন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির অসহায়তা ও স্বার্থপরতার দলিল হয়ে ওঠে, সন্দেহ নেই। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কথাকার রমাপদ তাঁর সমসাময়িক সময় ও সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তা নইলে এভাবে বিশ্বস্ত আখ্যান তৈরি করা সম্ভব হত না। তাঁর সৃষ্ট কুশীলবের কথোপকথনও যেন আমাদের অপরিচিত নয়।

সূত্রনির্দেশ :

১। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১৪ পৃ. ৪৫৯।

২। তদেব, পৃ. ৪৫৯।

৩। তদেব, পৃ. ৪৫৯।

৪। তদেব, পৃ. ৯।

৫। তদেব, পৃ. ৪৫৯।

৬। তদেব, পৃ. ৯।

৭। তদেব, পৃ. ১৭।

৮। তদেব, পৃ. ১৪, ১৫।

৯। তদেব, পৃ. ৪২।

১০। তদেব, পৃ. ৪২।

১১। তদেব, পৃ. ৪১।

১২। তদেব, পৃ. ৪৫।

১৩। বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান মুদ্রণ ২০০৯, পৃ.৩০।

১৪। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১৪, পৃ.১৪৩।

১৫। তদেব, পৃ. ৪৩৪।

১৬। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৭, পৃ. ৫১৮।

১৭। তদেব, পৃ. ৫১৮।

১৮। তদেব, পৃ. ৫১৭, ৫১৮।

১৯। তদেব, পৃ. ৫১৯।

২০। তদেব, পৃ. ৫১৯, ৫২০।

২১। তদেব, পৃ. ৯।

২২। তদেব, পৃ. ১৭।

২৩। তদেব, পৃ. ১০।

২৪। তদেব, পৃ. ১৮, ১৯।

২৫। তদেব, পৃ. ৫২০, ৫২১।

২৬। তদেব, পৃ. ২২২।

২৭। তদেব, পৃ. ৩৩।

২৮। তদেব, পৃ. ১৬৯।

২৯। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পূনর্মদ্রণ ২০১১-১২, পৃ.৪১০, ৪১১।

৩০। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০০৭, পৃ. ২৪৩।

৩১। শম্পা চৌধুরী, রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫৩।

৩২। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০০৭, পৃ. ৫২০।

৩৩। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মার্চ ২০০৩, পৃ. ৪৩৪।

৩৪। তদেব, পৃ. ৪৩৩।

৩৫। তদেব, পৃ. ৬৬।

৩৬। তদেব, পৃ. ২০,২১।

৩৭। তদেব, পৃ. ২৩।

৩৮। তদেব, পৃ. ১১।

৩৯। তদেব, পৃ. ১৩।

৪০। তদেব, পৃ. ৪০।

৪১। তদেব, পৃ. ৬৬।

৪২। তদেব, পৃ. ৩৮।

৪৩। তদেব, পৃ. ৫০।

৪৪। তদেব, পৃ. ৪১।

৪৫। তদেব, পৃ. ৬০।

৪৬। তদেব, পৃ. ১৯।

৪৭। তদেব, পৃ. ৫৫।

৪৮। তদেব, পৃ. ৪৩৫।

৪৯। তদেব, পৃ. ৪৩৪।

৫০। তদেব, পৃ. ৪৩৫।

৫১। তদেব, পৃ. ৮১।

৫২। তদেব, পৃ. ৮৩।

৫৩। তদেব, পৃ. ৮৪।

৫৪। তদেব, পৃ. ১২৬।

৫৫। তদেব, পৃ. ৮৬।

৫৬। তদেব, পৃ. ১০৮।

৫৭। তদেব, পৃ. ১১৬।

৫৮। তদেব, পৃ. ১২৫, ১২৬।

৫৯। তদেব, পৃ. ৯৮, ৯৯।

৬০। তদেব, পৃ. ৯৮।

৬১। তদেব, পৃ. ১১৮।

৬২। তদেব, পৃ. ১১৯।

৬৩। তদেব, পৃ. ১১৯, ১২০।

৬৪। তদেব, পৃ. ১২৭।

৬৫। তদেব, পৃ. ৪৩৬।

৬৬। তদেব, পৃ. ১৪৭, ১৪৮।

৬৭। তদেব, পৃ. ১৮২।

৬৮। তদেব, পৃ. ১৮২।

৬৯। তদেব, পৃ. ১৭০।

৭০। তদেব, পৃ. ১৭০।

৭১। তদেব, পৃ. ১৬৬।

৭২। তদেব, পৃ. ১৭৭।

৭৩। তদেব, পৃ. ১৭২।

৭৪। তদেব, পৃ. ১৮০।

৭৫। তদেব, পৃ. ১৮৬।

৭৬। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিসার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৭, পৃ. ৫২৬।

৭৭। তদেব, পৃ. ৩১২, ৩১৩।

৭৮। তদেব, পৃ. ৩৩০।

৭৯। তদেব, পৃ. ৩৩০, ৩৩১।

৮০। তদেব, পৃ. ৩২৮।

৮১। তদেব, পৃ. ৩১৯।

৮২। তদেব, পৃ. ৩১৯।

৮৩। তদেব, পৃ. ৩২৪।

৮৪। তদেব, পৃ. ৩২২।

৮৫। তদেব, পৃ. ৩২২।

৮৬। তদেব, পৃ. ৩২৬।

৮৭। তদেব, পৃ. ৩৩১।

৮৮। তদেব, পৃ. ৩৪৫।

৮৯। তদেব, পৃ. ৩৬২।

৯০। শম্পা চৌধুরী, রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৬৯।

৯১। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৭, পৃ. ৩৬২।

৯২। তদেব, পৃ. ৫২৭।

৯৩। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ মার্চ ২০০৩, পৃ. ৪০৩।

৯৪। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৭, পৃ. ৩৪৭।

৯৫। তদেব, পৃ. ৩৬৩।